জোহান ওয়েস-এর

সুইস ফ্যামিলি রবিনসন

রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ

BanglaBook.org

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকদ্বয়ের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail. alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

একাত্তর টাকা

SWISS FAMILY ROBINSON
By: Johan wyss
Trans. by: Neaz Morshed

BLEAK HOUSE
By: Charles Dickens
Trans.by: Qazi Shahnoor Husain

OUR MUTUAL FRIEND
By: Charles Dickens
Trans.by: Qazi Shahnoor Husain

জোহান ওয়েস

সুইস ফ্যামিলি রবিনসন

নিয়াজ মোরশেদ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

একটানা ছ'দিন ধরে ঝড় চলছে। সপ্তম দিনে এসে কমা তো দূরের কথা আরো প্রচণ্ড রূপ নিতে শুরু করলো তা।

প্রবল বাতাসের ঝাপটায় আমরা যে কোথায় এসে পড়েছি কেউ জানে না। জাহাজের ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে নাবিক-খালাসীরা পর্যন্ত ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে। জাহাজ বাঁচানোর জন্যে গত ছ'দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়েছে বেচারাদের। ছ'দিনে ওরা ছ'ঘণ্টাও ঘুমিয়েছে কিনা সন্দেহ। আমাদের অবস্থাও তা-ই। এই পরিস্থিতিতে ঝড়ের বেগ না কমে যখন আরো বাড়তে শুরু করলো তখন রীতিমতো মুষড়ে পড়লো সবাই। গতকাল পর্যন্ত মনে ক্ষীণ আশা ছিলো, এবার ধীরে ধীরে কমে আসবে ঝড়, এ যাত্রা হয়তো বেঁচে যাবো। কিন্তু কোথায় কি!

ইতিমধ্যে ভেঙে পড়েছে মাস্তুলগুলো। ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে গেছে সাগরে। জাহাজের গায়ে বেশ কয়েকটা জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। দ্রুত পানিতে ভরে যাচ্ছে খোল। সেই সাথে আতঙ্ক ভর করছে আমাদের মনের মধ্যে।

আমার স্ত্রী এলিজাবেথ এবং চার ছেলের দিকে চেয়ে দেখলাম, ভয়ে জড়সড় হয়ে প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে বসে আছে। ওদের ভয় ভাঙানোর মতো কোনো ভাষা আমি খুঁজে পেলাম না। অবশেষে ধীর শান্ত গলায় বললাম, 'এসো আমরা প্রার্থনা করি। একমাত্র ঈশ্বরই এখন পারেন আমাদের বাঁচাতে। তাঁর অসাধ্য কিছু নেই। সবচেয়ে বড় কথা ঈশ্বর যা করেন আমাদের মঙ্গলের জন্যেই করেন।'

সঙ্গে সঙ্গে এলিজাবেথ চোখের কোণ থেকে পানি মুছে ফেললো। তার হাঁটুতে মুখ গুঁজে থাকা ছোট ছেলে দুটোকে একটু সান্ত্বনা দিলো। এমন সময় ডেকের ওপর থেকে ভেসে এল একটা চিৎকার:

'ডাঙা! ডাঙা!'

ঠিক তক্ষুণি একটা ডুবো পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খেলো জাহাজ। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগলো আমাদের শরীরে। মড়মড় করে উঠলো খোল। মনে হলো এই বুঝি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল পুরো জাহাজটা। পরমুহূর্তে ফুঁসে ওঠা সাগর আছড়ে পড়লো আমাদের ওপর। ক্যাপ্টেনের উত্তেজিত চিৎকার শুনতে পেলাম:

'জাহাজ ডুবে যাচ্ছে! জলদি! জলদি নৌকা নামাও!'

'জাহাজ ডুবে যাচ্ছে!' ছেলেদের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেনের কথার প্রতিধ্বনি করলাম আমি। চিৎকার করে কেঁদে উঠলো ছোট দু'জন। এলিজাবেথের মুখটাও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

'তোমরা নোড়ো না এখান থেকে, আমি ডেকে উঠে দেখে আসছি কি

অবস্থা!' বলেই আমি বেরিয়ে এলাম কেবিন থেকে। বিরাট একটা ঢেউ ভেঙে পড়লো আমার ওপর। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম ডেকে। সারা শরীর ভিজে গেল আমার।

ঢেউটা চলে যেতেই আবার উঠে দাঁড়ালাম আমি। প্রবলভাবে দুলছে জাহাজ। এর ভেতরে যতটা সম্ভব তাল রেখে এগোলাম সামনের দিকে। কয়েক সেকেণ্ড পরে যা দেখলাম তাতে আমার আশা ভরসা সব নির্মূল হয়ে গেল। আড়াআড়িভাবে দু'টুকরো হয়ে গেছে জাহাজটা। খালাসীরা সব ক'টা নৌকা জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। টপাটপ উঠে পড়ছে নাবিকরা। অস্থিরভাবে ছুটে গেলাম আমি সে দিকে।

'একটু দাঁড়াও!' চিৎকার করলাম আমি। 'আমাদের ফেলে যেও না! নিয়ে যাও তোমাদের সাথে!' কিন্তু আমার কথা শুনতে পেলো না ওরা। চাপা পড়ে গেল ঝড়ের গর্জনের তলে। দেখতে দেখতে ঢেউ আর বাতাসের ধাক্কায় দূরে চলে গেল নৌকাগুলো। আমরা ছ'টা প্রাণী কেবল পড়ে রইলাম ডুবন্ত জাহাজটায়!

কয়েক মুহূর্ত হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। তারপরই সচেতন হলাম, বাঁচাতে হবে, নিজেকে এবং পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষগুলোকে। চারদিকে আর একবার তাকাতেই আশা জেগে উঠলো মনে। বিপদের মাত্রা একবিন্দু কমেনি, তবু আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। জাহাজের যে অংশে আমাদের কেবিন– অর্থাৎ পেছনটা একটু উঁচু হয়ে আটকে গেছে দুটো ডুবো পাহাড়ের মাঝখানে। মনে হয় বেশ শক্তভাবেই আটকেছে, এখন আর কোনো দুলুনি অনুভব করছি না পায়ের নিচে। তার মানে জাহাজে যত ফাটলই দেখা দিক ডুবে যাওয়ার ভয় নেই। দক্ষিণ দিকে চোখ পড়তেই দূরে দেখতে পেলাম ডাঙা। বৃষ্টি আর মেঘের ফাঁকে ফাঁকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। কোনো মতে যদি একবার ওখানে পৌঁছুতে পারি, হয়তো বেঁচে যাবো এ যাত্রা।

কেবিনে ফিরে এলাম।

'মনে সাহস আনো,' স্ত্রী আর ছেলের দিকে তাকিয়ে বললাম। 'দুটো ডুবো জাহাজের মাঝখানে আটকে গেছে জাহাজ। এখন আর ডুবছে না। যত জোরেই ঝড় আসুক, আমরা এখন নিরাপদ। আশা করি কাল নাগাদ ঝড় কমে যাবে। তারপর আর চিন্তা নেই···ডাঙা খুব দূরে নয়।'

একথা শুনে, মনে হলো, দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল ওদের।

'চলো আমরা কিছু খেয়ে নেই,' বললো এলিজাবেথ, 'শরীর মন দুটোই একটু জোর পাবে।'

খাবার তৈরি করতে বসলো আমার স্ত্রী। ঝড় এখনো তীব্র আক্রোশে বয়ে চলেছে। প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। জাহাজের যে অংশটুকু এখনো অক্ষত আছে তার কাঠ তক্তা মড়-মড়, কট-কট শব্দে খুলে খুলে পড়ছে। নৌকায় করে যারা প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেছে, আমার ধারণা, ঝড়ের এই রুদ্ররোষ থেকে কিছুতেই তারা বাঁচতে পারবে না।

খাবার তৈরি হলে ছেলেরা ক্ষুধার্তের মতো খেলো। আমি আর এলিজাবেথ খেলাম সামান্য। খাওয়ার পর শুয়ে পড়লো ছেলেরা। একটু পরেই তলিয়ে গেল

BanglaBook.org

গভীর ঘুমে। আমাদের বড় ছেলে ফ্রিৎস কেবল জেগে রইলো আমাদের সাথে। পনর বছর বয়েস ওর।

জেগে বসে আছি আমরা তিনটে প্রাণী। বসে বসে প্রার্থনা করছি আর সাগরের একটানা গর্জন শুনছি। দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছি, কখন ঢেউয়ের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে জাহাজের অক্ষত অংশটুকু।

'ভাবছি,' হঠাৎ নীরবতা ভাঙলো ফ্রিৎস, 'ঝড়ে যদি জাহাজটা ভেঙে যায়, কি করে বাঁচবো আমরা? মা আর ওদের নিয়েই বেশি চিন্তা,' ঘুমন্ত ছোট তিন ভাইয়ের দিকে ইশারা করলো ও, 'বাতাস ভর্তি রবারের থলে বা শোলার পোশাক জাতীয় কিছু থাকলে ভালো হতো!'

'ভালো কথা মনে করেছো,' বললাম আমি। 'চলো দেখি, পিপে বা বাক্স জাতীয় কিছু পাওয়া যায় কিনা। জাহাজ যদি ভেঙেই পড়ে ওগুলো ধরে ভেসে থাকা যাবে।'

কেবিনের ভেতর খুঁজতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণের ভেতর বেশ কয়েকটা ছোট ছোট খালি পিপে, বাক্স আর বড় কৌটো পেয়ে গেলাম। তোয়ালে ছিঁড়ে দুটো তিনটে করে পিপে-বাক্স এক সাথে বেঁধে রেখে দিলাম ঘুমন্ত ছেলেদের মাথার কাছে। প্রয়োজনের সময় শোলার পোশাকের কাজ করবে ওগুলো। ফ্রিৎস-এর মা নিজের জন্যে তৈরি করে নিলো একটা। প্রত্যেকের কোমরে গুঁজে নিলাম একটা করে ছুরি। বেশ খানিকটা দড়ি রাখলাম একটা পিপের ভেতর।

এর পর আর বসে থাকতে পারলো না ফ্রিৎস। ভাইদের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লো গুটিসুটি হয়ে। একটু পরেই ঘুমিয়ে গেল ও-ও।

ভোর হওয়ার একটু আগে মনে হলো বাতাসের দাপট যেন সামান্য কমেছে। কান খাড়া করে অপেক্ষা করছি। একটু পরেই নিশ্চিত হলাম, হ্যাঁ, সত্যিই কমেছে ঝড়। ভোরের আলো ফুটে উঠতে উঠতে প্রায় শান্ত হয়ে এলো সাগর। আনন্দে ভরে উঠলো আমার মন। ঝটপট ঘুম থেকে জাগালাম ছেলেদের। সবাই মিলে উঠে এলাম ডেকে।

গত রাতের তাণ্ডবের চিহ্নমাত্র নেই। চারপাশে খোলা শান্ত সাগর। পুব আকাশ রাঙা করে সূর্য উঠছে।

'নাবিকদের কাউকে দেখছি না কেন?' হঠাৎ প্রশ্ন করলো এলিজাবেথ।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরাও খেয়াল করলো ব্যাপারটা। অবাক চোখ তুলে ওরাও জিজ্ঞেস করলো, 'তাই তো, কোথায় ওরা?'

কোথায় ওরা বললাম। শুনে ভুরু কুঁচকালো এলিজাবেথ। লোকগুলোর স্বার্থপরতায় মর্মাহত হয়েছে ও। ব্যাপারটা নিয়ে আর বেশি ভাবার অবকাশ দিলাম না ওকে। বললাম:

'এবার এসো, ভাবনা চিন্তা করে দেখা যাক; কিভাবে আমরা তীরে পৌঁছতে পারি।'

'সাগর এখন শান্ত,' বললো ফ্রিৎস, 'পানিতে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে চলে গেলেই তো হয়!'

'তোমার জন্যে কাজটা খুব সোজা, তুমি সাঁতার জানো,' আপত্তি জানালো

BanglaBook.org

আর্নেস্ট। 'কিন্তু আমরা পানিতে নামলেই ডুবে যাবো। তার চেয়ে ভেলা জাতীয় কিছু একটা বানিয়ে সবাই তাতে চড়ে গেলে হতো না?'

'খুব ভালো প্রস্তাব,' জবাব দিলাম আমি। 'তাহলে চলো, খুঁজে দেখা যাক, ভেলা বানানোর সাজ-সরঞ্জাম কি কি পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস কি আছে তা-ও খুঁজে দেখতে হবে।'

আমরা ছড়িয়ে পড়লাম সারা জাহাজে। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু দরকারী জিনিসের খোঁজ পেলাম। ফ্রিৎস গেল গোলা-বারুদ রাখার কামরায়। বেশ কয়েকটা বন্দুক, কয়েক থলে গুলি এবং সম্পূর্ণ শুকনো অবস্থায় কয়েক পিপে বারুদের খোঁজ পেলো ও। ডেকে ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে এলো দুটো বন্দুক, কিছু বারুদ আর এক থলে গুলি। আর্নেস্ট আমার মেজো ছেলে। তের বছর বয়েস। সে গেল ছুতোর মিস্ত্রীর কামরায়। ও খুঁজে পেলো যন্ত্রপাতি আর জাহাজ মেরামতের জন্যে রাখা অতিরিক্ত কাঠ। হাতুড়ি, বাটাল এ ধরনের বেশ কয়েকটা যন্ত্র আর এক টুপি ভর্তি পেরেক নিয়ে ডেকে ফিরলো ও। জ্যাক আমার সেজো ছেলে, বয়েস বারো– ক্যাপ্টেনের কেবিনে গিয়ে পেলো জ্যান্ত দুটো কুকুর। সেদুটোকে নিয়েই ও ফিরেছে ডেকে। ও পরে বলেছে, কুকুর দুটো ওকে দেখে এত খুশি হয়ে উঠেছিলো যে লাফিয়ে এসে ওকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে ওর সারা গা চেটে আদর জানিয়েছিলো। আট বছর বয়েসী ফ্রান্সিস–আমার ছোট ছেলে, গেল ওর মার সঙ্গে। বড় এক বাক্স বড়শি নিয়ে ফিরলো ও। ওর মা বললো, 'আমি কিছু আনতে পারিনি বটে তবে যে জিনিসের খোঁজ পেয়েছি, শুনলে অবাক হয়ে যাবে। আমরা এখন একটা গরু, একটা গাধা, দুটো ছাগল, একটা শূকর, ছ'টা ভেড়া আর বেশ কয়েকটা হাঁস ও মুরগির মালিক। আমি আর ফ্রান্সিস খাইয়ে এলাম ওদের। একটানা সাতদিন অনাহারে থেকে মরতে বসেছিলো বেচারারা।'

আমার খুদে শ্রমিকদের দিকে তাকালাম। 'চমৎকার কাজ করেছো তোমরা…শুধু জ্যাক বাবু ছাড়া। দরকারী কিছু না এনে দুটো বোঝা নিয়ে এসেছো তুমি।'

'উঁহুঁ,' বললো জ্যাক, 'এগুলোও দরকারী। আগে ডাঙায় পৌছে নাও, তখন বুঝবে দরকারী কি-না। শিকারের সময় কত কাজে লাগবে তা জানো?'

'তা ঠিক,' বললাম আমি, 'কিন্তু আগে ডাঙায় তো পৌছুতে হবে, নাকি? ডাঙায় পৌঁছানোর কি উপায়?'

'আমার মনে হয়, তোমরা যত ভাবছো তত কঠিন নয় ব্যাপারটা।' ঘাড় ঘুরিয়ে ডেকের মাঝামাঝি এক জায়গায় তাকালো জ্যাক। 'ঐ বড় পিপেগুলোর একেকটায় আমরা একেকজন উঠে পড়লেই তো পারি। গতবার গরমের সময় নানা বাড়ি গিয়ে ও রকম একটা পিপেতে করে পুকুর পাড়ি দিয়েছিলাম আমি।'

কথাটা শুনে একটা বুদ্ধি খেলে গেল আমার মাথায়।

'তাড়াতাড়ি, জ্যাক, করাত, তুরপুন আর কিছু পেরেক দাও আমাকে, তারপর দেখি কি করা যায়!'

ঝটপট চারটে বড় বড় খালি পিপে এক জায়গায় নিয়ে এলাম আমরা। খুব

BanglaBook.org

ভালো কাঠে তৈরি পিপেগুলো, লোহার পাতে মুড়ে মজবুত করা হয়েছে দু'প্রান্ত। জাহাজের পানিভর্তি খোলে ফেলে দেখলাম একটা, সুন্দর ভাসে। মনে হচ্ছে এই পিপে দিয়েই কাজোদ্ধার হবে। ছেলেদের সহায়তায় একে একে চারটে পিপেই দু'টুকরো করে ফেললাম করাত চালিয়ে। সমান মাপের আটটা গামলা তৈরি হলো। আমার কাজ দেখতে দেখতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো এলিজাবেথ।

'উঁহুঁ,' বললো ও, 'কক্ষনো আমি ওতে করে সাগরে নামতে পারবো না।'

'অত ঝটপট সিদ্ধান্ত নিয়ো না,' একটু হেসে বললাম আমি। 'আমার কাজ আগে শেষ হোক তারপর বোলো।'

পিপেগুলো কাটার পর খুঁজে পেতে চারটে লম্বা মোটা বাতা দিয়ে এলাম। সেগুলো পাশাপাশি রেখে তার ওপর সারি দিয়ে সাজালাম পিপে কেটে বানানো গামলাগুলো। পেরেক ঠুকে বাতার সঙ্গে লাগিয়ে দিলাম সেগুলোর তলা। আমাদের অভিনব নৌকার তলী হিসেবে কাজ করবে বাতা চারটে। এরপর পেরেক মেরে একটার সাথে আরেকটা জুড়ে দিলাম গামলাগুলো। নৌকাটাকে আরো মজবুত করার জন্যে লম্বা দুটো তক্তা দু'পাশ থেকে এঁটে দিলাম গামলাগুলোর সঙ্গে। ব্যস কাজ শেষ। এবার *নৌকা* জলে ভাসিয়ে রওনা হলেই হলো।

কিন্তু জলে ভাসানোর সময়ই দেখা দিলো সমস্যা। জিনিসটা এত ভারি হয়েছে যে আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করেও এক চুল নড়াতে পারলাম না ওটা। ফ্রিৎসকে বললাম একটা শাবল যোগাড় করে আনতে। এই ফাঁকে আমি বেশ মোটা লম্বা একটা গোল কাঠ করাত দিয়ে কেটে কয়েকটা টুকরো করলাম। কাঠগুলো কোনোমতে তলে দিতে পারলে নৌকা গড়িয়ে নেয়া যাবে।

ফ্রিৎস শাবল নিয়ে ফিরলো। শাবল বাধিয়ে চাড় দিয়ে খুব সহজেই উঁচু করে ফেললাম নৌকার একটা প্রান্ত। ফ্রিৎসকে একটা গোল কাঠ ঢুকিয়ে দিতে বললাম তলে। এবার ঠেলা দিতেই এগোলো নৌকা। যদিও খুব আস্তে, কিন্তু এগোলো। তারপর আরেকটা গোল কাঠ দেয়া হলো তলে। তারপর আরও একটা। অনায়াসে নৌকাটাকে গড়িয়ে নিয়ে গেলাম আমরা পাটাতনের কিনার পর্যন্ত। যে দিকটাকে নৌকার পেছন হিসেবে ভাবছি সে প্রান্তে শক্ত লম্বা একটা দড়ি বেঁধে দিলাম, যাতে পানিতে নামালে ভেসে না যায়। তারপর ঠেলে ওটাকে নামিয়ে দিলাম পানিতে।

খুশিতে চিৎকার করে উঠলো ছেলেরা। খুব সুন্দরভাবে ভাসছে নৌকাটা। ওদের মায়ের মুখেও হাসি ফুটে উঠেছে: হ্যাঁ, ওটায় চড়ে সাগরে ভাসা যায়।

এবার কয়েকটা দাঁড় বানাতে হবে। ডেকের ওপরেই পাওয়া গেল প্রয়োজনীয় কাঠ। ছুতোর মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আমাদের প্রত্যেকের জন্যে একটা করে দাঁড় বানিয়ে ফেলা কঠিন হলো না। যখন সব কাজ শেষ হলো তখন সন্ধ্যা হতে বিশেষ বাকি নেই। আমাদের সব জিনিসপত্র নিয়ে নৌকায় উঠতে উঠতে রাত নেমে আসবে। সুতরাং বাধ্য হয়েই ভেঙে পড়া জাহাজটায় দ্বিতীয় রাত কাটানোর জন্যে তৈরি হলাম আমরা। বুঝতে পারছি, জাহাজের যেটুকু এখনও টিকে আছে যেকোনো মুহূর্তে তা টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। তবু কিছু করার নেই। রাতের অন্ধকারে আমাদের ঐ অভিনব নৌকায় করে সাগর পাড়ি

দেয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। নৌকাটাকে জাহাজের সঙ্গে বেঁধে কেবিনে ফিরে এলাম আমরা।

নৌকা, দাঁড় ওসব বানানোর কাজে এত ব্যস্ত ছিলাম যে সারা দিনে এক টুকরো রুটি বা এক ফোঁটা পানি মুখে দেয়ার অবসর পাইনি কেউ। এবার এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো খিদে আর ক্লান্তি। আমার স্ত্রী খাবার তৈরি করেই রেখেছিলো। খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম।

দুই

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম আমরা। ঝটপট নাশ্‌তা সেরে নিয়ে তৈরি হলাম জিনিসপত্র নিয়ে নৌকায় ওঠার জন্যে। প্রাণীগুলোর জায়গা হবে না অত ছোট নৌকায়, তাই আপাতত রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওগুলোকে। সম্ভব হলে পরে এসে নিয়ে যাবো। কয়েক দিন অনায়াসে চলার মতো খাবার দিয়ে গেলাম ওদের। পায়রা এবং হাঁসগুলোকে ছেড়ে দিলাম খাঁচা থেকে—পারলে উড়ে বা সাঁতরে চলে যাক তীরে। মুরগিগুলো শুধু নিলাম সঙ্গে।

'ওদের জন্যে যদি খাবারের ব্যবস্থা না করতে পারি, ওরাই আমাদের খাবার হবে,' একটু হেসে বললাম আমি।

প্রথমবারে যে সব জিনিস সঙ্গে নেবো ঠিক করেছি সেগুলো হলো: এক পিপে বারুদ, তিনটে ছোট বন্দুক, তিনটে বড় বন্দুক, বেশ কিছু ছোট বড় গুলি; পিস্তল দু'জোড়া ছোট, একটা বড়; সীসা গলিয়ে গুলি তৈরি করার একটা ছাঁচও নিতে ভুললাম না। খাবার-দাবার হিসেবে নিলাম বড় এক বাক্স সুপ-কেক আর এক বাক্স শক্ত বিস্কুট। এসব ছাড়াও নিলাম একটা ছিপ, এক বাক্স পেরেক, এবং ছুতোর মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি—যেমন, হাতুড়ি, করাত, ঝাঁটালি, তুরপুন, কুড়াল ইত্যাদি। সব শেষে কিছু পালের কাপড়। এছাড়া প্রত্যেকের কাঁধে রইলো একটা করে ঝোলা। ছেলেরা আরো টুকটাক নানা জিনিস সংগ্রহ করে আনলো। কিন্তু আপাতত সেগুলো রেখে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। এত জিনিসের জায়গা হবে না নৌকায়!

অবশেষে ভেসে পড়ার সময় হলো। বুক বেঁধে একজন একজন করে নামলাম গামলার নৌকায়। একেবারে সামনের গামলায় বসলো এলিজাবেথ; দ্বিতীয়টায় আমাদের ছোট ছেলে ছ'বছরের ফ্রান্সিস; তৃতীয়টায় ফ্রিৎস, ষষ্ঠটায় সেজো ছেলে জ্যাক, সপ্তমটায় মেজো ছেলে আর্নেস্ট এবং একেবারে শেষে আমি। চতুর্থ এবং পঞ্চম গামলায় রয়েছে জিনিসপত্র—চতুর্থটায় বারুদের পিপে, মোরগ-মুরগি আর পালের কাপড়; পঞ্চমটায় খাবার দাবার আর অন্য সব জিনিস।

জাহাজের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা কেটে দিয়ে দাঁড় তুলে নিলাম হাতে। হঠাৎ পেছনে ঝপাং ঝপাং দুটো শব্দ শুনে চমকে ঘাড় ফেরালাম আমি। অন্যরাও। অবাক হয়ে দেখলাম কুকুর দুটো—টার্ক আর পনটো ঝাঁপিয়ে পড়েছে পানিতে।

আমরা ওদের ফেলে যাচ্ছি মনে করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো।

ওদের লাফিয়ে পড়তে দেখেই অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম আমি। এখন যদি বেয়ে ছেয়ে নৌকায় ওঠার চেষ্টা করে তাহলেই গেছি! বেশ বড় কুকুর দুটো, ওজনও কম নয়, নির্ঘাত উল্টে যাবে নৌকা। তবে একটু পরেই পরম স্বস্তির সঙ্গে খেয়াল করলাম সে চেষ্টা করলো না ওরা। নিরুপদ্রবে সাঁতরে আসতে লাগলো নৌকার পেছন পেছন। ক্লান্ত হয়ে গেলে আমাদের বাড়িয়ে দেয়া দাঁড়ের ওপর থাবা রেখে বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে। একটু পরে দেখি হাঁসগুলোও উড়ে এসে পানিতে পড়েছে। কুকুরগুলোর মতো ওরাও সাঁতরে চললো আমাদের পাশে পাশে।

ধীরে ধীরে তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নৌকা। আমরা দাঁড় টেনে চলেছি একটানা। ছোট্ট ফ্রান্সিসের পর্যন্ত ক্লান্তি নেই। সাগর শান্ত। ছোট ছোট ঢেউ আস্তে এসে বাড়ি খাচ্ছে নৌকার গায়ে। মেঘশূন্য নীল আকাশ। দূরে দেখতে পাচ্ছি ডাঙা। মনটা একটু দমে গেল আমার। এতদূর থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি না, তবু মনে হচ্ছে জায়গটা পাহাড়ী। গাছপালা আদৌ আছে কিনা কে জানে? এ নিয়ে আর খুব একটা ভাবলাম না। পাহাড়ী হোক আর যা-ই হোক ওখানেই যেতে হবে আমাদের, এছাড়া কোনো উপায় নেই।

তীরের আরো কাছে এগিয়েছে নৌকা। এবার একটু যেন সবুজের আভাস লক্ষ করছি ধূসর পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে। হঠাৎ খেয়াল হলো, দূরবীন আনা হয়নি। একদম মনে পড়েনি জিনিসটার কথা। সাথে একটা দূরবীন থাকলে এখনই দেখে নিতে পারতাম দ্বীপটার আসল চেহারা।

ভাবতে না ভাবতেই দেখি, ছেলেদের ভেতর যে সবচেয়ে চটপটে সেই জ্যাক পকেট থেকে ছোট একটা দূরবীন বের করে চোখে লাগিয়েছে। ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে কোনো এক ফাঁকে ও যোগাড় করেছে ওটা। আমি দূরবীন আনতে ভুলে গেছি শুনে ও ওটা দিয়ে দিলো আমাকে।

দূরবীন চোখে লাগিয়ে খুশি হয়ে উঠলো আমার মন। যা ভেবেছিলাম তা নয়। দ্বীপটা পাহাড়ী বটে, তবে গাছপালাও আছে। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে, তীরের কাছাকাছি বেশ কিছু নারকেল গাছ দেখতে পাচ্ছি। ছেলেদের বলতেই খুশিতে লাফিয়ে উঠলো ওরা।

'এবার প্রাণ ভরে ডাব-নারকেল খেতে পারবো,' প্রায় এক সাথে বলে উঠলো সবাই।

দূরবীনটা পাওয়ায় খুব ভালো হয়েছে। কোনখান দিয়ে ডাঙায় নামা সুবিধাজনক হবে তা আগেই দেখে নিতে পারলাম। এবং সেই অনুযায়ী নৌকার গতিপথ ঠিক করলাম। কিন্তু একটু পরেই অপ্রত্যাশিত একটা স্রোতের মুখে পড়ে গেল নৌকা। প্রাণপণে দাঁড় টেনেও তার টান থেকে বেরুতে পারলাম না আমরা। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে রইলাম, স্রোত যেদিকে নিয়ে যায় সেদিকেই যেতে হবে।

কয়েক মিনিটের ভেতর তীরের কাছাকাছি চলে এলো নৌকা। স্রোতের টানে একটা খাঁড়ির মুখে এসে পড়েছি। কখন যে হাঁসগুলো আমাদের পেছনে ফেলে খাঁড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে খেয়াল করিনি। ওদের পেছন পেছন আমরাও ঢুকলাম

BanglaBook.org

খাঁড়িতে। কূলের কাছাকাছি নিয়ে গেলাম নৌকা। নৌকা ভেড়ানোর মতো একটা জায়গা খুঁজে পেতে বেশি দেরি হলো না। পানি থেকে নৌকার গামলাগুলোর উচ্চতা আর জায়গাটার উচ্চতা প্রায় সমান। পানির গভীরতাও সেখানে খুব কম।

দাঁড় টানা বন্ধ করতে বললাম ছেলেদের। ধীরে ধীরে কূলে নিয়ে ভিড়ালাম নৌকা। উৎফুল্ল ভঙ্গিতে লাফিয়ে ডাঙায় নেমে পড়লো ছেলেরা। এলিজাবেথ সাবধানে উঠে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে নামলো তীরে। সবশেষে আমি। কয়েক সেকেণ্ড পরেই লাফিয়ে ডাঙায় উঠলো কুকুর দুটো। গা ঝেড়ে পানি ছিটাতে ছিটাতে ওরা ঘেউ ঘেউ করে উঠলো খুশিতে। এই ফাঁকে হাঁসগুলোও কূলে উঠে পড়েছে। এক সঙ্গে সবকটা প্যাঁক প্যাঁক করছে। এই পরিস্থিতিতে মুরগিগুলোই বা চুপ করে থাকে কেন? মনের আনন্দে গলা ছাড়লো ওরাও– কক্‌কক-কোঁকোর কোঁও-ও-ও! সব মিলে একেবারে এলাহি কাণ্ড। এমন সময় দূর থেকে ভেসে এলো পেঙ্গুইন আর ফ্ল্যামিঙ্গোর ডাক। অনাহূত অতিথিদের শোরগোলে বিরক্ত তারা। দু'একটা ফ্ল্যামিঙ্গোকে দেখলাম, মাথার ওপর চক্কর দিতে শুরু করেছে। মোটকথা আমাদের ডাঙায় নামার পর্বটা বেশ জাঁকজমকের ভেতর দিয়েই শেষ হলো।

পায়ের নিচে মাটি পাওয়ার পর প্রথমেই হাঁটু গেড়ে বসলাম সবাই। সমস্ত অন্তর দিয়ে ধন্যবাদ জানালাম ঈশ্বরকে। তাঁর করুণা ছাড়া এযাত্রা কিছুতেই আমরা বাঁচতে পারতাম না।

প্রার্থনার পর মন দিলাম নৌকা থেকে মালপত্র নামানোর কাজে। খুব সামান্য জিনিস আনতে পেরেছি জাহাজ থেকে। তবু সেগুলোই যখন তীরে নামিয়ে রাখলাম, মনে হলো, রীতিমতো ধনী আমরা!

এবার দরকার মাথা গোঁজবার মতো একটা ঠাঁই। হয় খুঁজে বের করতে হবে, নয়তো তৈরি করতে হবে। আপাতত খুঁজে বের করার চেয়ে তৈরি করে নেয়াই সহজ মনে হলো। পাথরের খাঁজে একটা দাঁড় ঢুকিয়ে দিলাম সোজা করে। তার সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে বাঁধলাম আরেকটা দাঁড়। তার ওপর দিলাম পালের কাপড়। কোনাগুলো টেনে ছড়িয়ে দিলাম যতদূর যায়। চলনসই একটা তাঁবু তৈরি হলো। খাবার ভর্তি বাক্সগুলো সাজিয়ে দিলাম তাঁবুর মুখে। রাতের বেলা ওগুলো দরজার কাজ করবে। শুকনো ঘাস আর শ্যাওলা যোগাড় করে আনতে বললাম ছেলেদের– রাতে বিছানার কাজ দেবে। কিছুক্ষণের ভেতর তাঁবুর সামনে শুকনো ঘাস আর শ্যাওলার বিশাল এক স্তূপ করে ফেললো ওরা।

এই ফাঁকে আমি তাঁবু থেকে কিছুটা দূরে, ছোট একটা ঝর্ণার পাশে একটা রান্নাঘর তৈরি করলাম। রান্নাঘর মানে তিন চারটে পাথর সাজিয়ে একটা চুলা; আর তার তিন দিকে একটু উঁচু করে আরো কয়েকটা পাথর সাজিয়ে একটা আড়াল, যেন বাতাস এসে আগুন নিভিয়ে দিতে না পারে। খোঁজাখুঁজি করে কিছু ডালপালা যোগাড় করে আনলাম। তারপর শুকনো ঘাস আর ডালপালার সাহায্যে চলনসই একটা আগুন তৈরি করলাম চুলায়।

এরপর দায়িত্ব নিলো এলিজাবেথ। পিচ্চি ফ্রান্সিসকে নিয়ে রান্নার কাজে লেগে গেল সে। একটা টিনের পাত্রে পানি নিয়ে তার ভেতর কয়েকটা সুপ-কেক

BanglaBook.org

ছেড়ে দিয়ে পাত্রটা চাপিয়ে দিলো চুলায়।

'মা, আঠা বানাচ্ছো কেন? আঠা দিয়ে কি করবে?' হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো ফ্রান্সিস। সত্যিই সুপ কেকগুলোর রঙ অনেকটা আঠার মতো।

'সুপ বানাবো,' হেসে জবাব দিলো এলিজাবেথ।

'সুপ বানাবে!? সুপ বানাতে তো মাংস লাগে! এখানে দোকান কই? মাংস পাবে কোথায়?'

'শোনো, বাপ,' এবার কথা বললাম আমি। 'তুমি যেটাকে আঠা মনে করছো সেটা আসলে চমৎকার মাংস। বিশেষ উপায়ে তৈরি ওগুলো। যাতে পচে না যায় সেজন্যে আগে ভালো করে শুকিয়ে নেয়া হয়েছে। নাবিকদের মাসের পর মাস জাহাজ নিয়ে সাগরে ঘুরতে হয়। অতদিন মাংস খেতে হলে কত গরু ছাগল সঙ্গে নিতে হবে একবার ভাবো! সে জন্যে ওরা বিশেষ উপায়ে এই সুপ-কেক তৈরি করেছে। পানিতে দিয়ে সিদ্ধ করে নিলেই হলো–চমৎকার সুপ। নোনা মাংসের চেয়ে এগুলো খেতে অনেক ভালো।'

ইতিমধ্যে বন্দুকগুলোয় গুলি বারুদ ভরে ফেলেছে ফ্রিৎস। একটা কাঁধে ঝুলিয়ে ও এগিয়ে গেল খাঁড়ির চারপাশটা পর্যবেক্ষণ করতে। যাওয়ার আগে আর্নেস্টকে বললো সঙ্গে যেতে। কিন্তু আর্নেস্ট জানিয়ে দিলো, ও পাহাড়ী জায়গায় হাঁটাহাঁটি পছন্দ করে না। সুতরাং ফ্রিৎস একাই গেল, আর্নেস্ট ঘুরতে লাগলো সমুদ্রের কিনারে।

এদিকে একটু দূরে এক সারি বড় বড় পাথরের পাশ দিয়ে জ্যাকও এগিয়ে গিয়েছিল সাগরের দিকে। একটু পরেই ওর চিৎকার শুনতে পেলাম:

'বাঁচাও! বাঁচাও!'

পাংশু হয়ে গেল আমার স্ত্রীর মুখ। ছোট একটা কেটল তুলে নিয়ে ছুটলাম আমি। হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক। তিড়িংবিড়িং করে লাফাচ্ছে; হাত ছুঁড়ছে আর চেঁচাচ্ছে, 'বাঁচাও! বাঁচাও! মরলাম!'

তাড়াতাড়ি পানিতে নেমে গেলাম আমি। স্বচ্ছ টলটলে জল। তাকাতেই দেখলাম ইয়া বড় এক সামুদ্রিক গলদা চিংড়ি লম্বা ঠ্যাঙের মাথায় আঁকশির মতো নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে জ্যাকের পা। কুড়ালের এক ঘায়ে চিংড়িটার ঠ্যাং কেটে দিলাম। তারপর জ্যাককে নিয়ে ফিরে এলাম তাঁবুর কাছে। চিংড়িটা তুলে নিতে ভুলিনি।

কিছুদূর আসার পর চিংড়িটা আমার হাত থেকে নিয়ে নিলো জ্যাক। ও নিজের হাতে মাকে উপহার দিতে চায় ওটা।

'মা, মা, দেখ, একটা সামুদ্রিক চিংড়ি ধরেছি!' তাঁবুর কাছাকাছি পৌঁছে চিৎকার করে উঠলো জ্যাক। 'আর্নেস্ট, দেখ, কি বিরাট চিংড়ি! ফ্রিৎস কোথায়? ফ্রিৎস!' এমন সময় লেজ দিয়ে একটা ঝাপটা মারলো চিংড়িটা। 'ফ্রান্সিস সাবধান, হাত দিয়ো না, কামড়ে দেবে!'

জ্যাককে ঘিরে ধরেছে সবাই। অবাক চোখে দেখছে বিরাট গলদা চিংড়িটা। ওটার কাটা পা উঁচু করে দেখালো জ্যাক।

'এটা দিয়ে আমার পা খামচে ধরেছিলো। এমন শিক্ষা দিয়েছি না, জীবনে

BanglaBook.org

আর কখনো খামচাতে হবে না?' ভাবখানা ও-ই শিক্ষা দিয়েছে চিংড়িটাকে।

'জ্যাক, আসল ঘটনাটা ফাঁস করে দেবো?' মুচকি হেসে চোখ পাকিয়ে বললাম আমি। লাল হয়ে গেল জ্যাক। ওকে বাঁচাতে তাড়াতাড়ি যোগ করলাম, 'যা হোক, জ্যাকই প্রথম আমাদের জন্যে কিছু একটা খাবার যোগাড় করতে পেরেছে।'

'আমিও একটা জিনিসের খোঁজ পেয়েছি, খেতে খুব মজা,' বলে উঠলো আর্নেস্ট।

'হুঁহ, মজা না ছাই!' বললো জ্যাক। 'নিশ্চয়ই শামুক-টামুক কিছু পেয়েছো। কিন্তু আমার চিংড়িটার কথা ভাবো একবার!'

'উঁহুঁ, জ্যাক, শামুক নয়, ঝিনুক,' প্রতিবাদ করলো আর্নেস্ট।

'ঝিনুক! নিয়ে এসো দেখি কয়েকটা,' আর্নেস্টের দিকে তাকিয়ে বললাম আমি।

'এক্ষুণি যাচ্ছি। সাথে কিছু লবণও আনবো। পাথরের খাঁজে এক জায়গায় দেখেছি, অনেক জমে আছে। সাগরের পানি শুকিয়েই ওগুলো হয়েছে, তাই না বাবা?'

'নিঃসন্দেহে। তাছাড়া আর কোথা থেকে আসবে? এখন যাও সুপটা যদি নুন ছাড়া খেতে না চাও তো নিয়ে এসো তোমার লবণ।'

পা চালিয়ে চলে গেল ও। ফিরলো একটু পরেই, শুধু লবণ নিয়ে! ঝিনুক আনেনি। যাকগে আপাতত ঝিনুক না হলেও খাওয়া চলবে আমাদের। দেখলাম ওর আনা লবণে লবণের চেয়ে বালির পরিমাণ বেশি। ফেলে দিতে গেলাম। বাধা দিলো এলিজাবেথ। খানিকটা লবণ পানিতে গুলে এক টুকরো মসলিন কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিয়ে পানিটুকু মিশিয়ে দিলো সুপের সাথে। চেখে দেখলো। মাথাটা একটু নেড়ে বললো, 'হুঁ, এখন অনেক ভালো লাগছে। কিন্তু ফ্রিৎস আসছে না কেন এখনো?' চিন্তিত শোনালো ওর গলা। একটু চুপ করে থেকে আবার বললো, 'সুপ তো তৈরি হলো, কিন্তু খাওয়া যাবে কি করে? চামচ নেই, কোনো বাসন-পেয়ালা নেই!'

'কয়েকটা নারকেল যোগাড় করতে পারলে হতো,' পরামর্শ দিলো আর্নেস্ট। খোলাগুলো দিয়ে দিব্বি পেয়ালা বানিয়ে নেয়া যেতো।

'তা ঠিক, কিন্তু নারকেল পাচ্ছো কোথায়?' বললাম আমি।

'তাহলে?' ভাবনায় পড়ে গেল আর্নেস্ট। এক মুহূর্ত পরেই লাফিয়ে উঠলো, 'পেয়েছি! বড় ঝিনুকের খোলা ব্যবহার করতে পারি আমরা!'

'হুঁ, এই বুদ্ধিটা বের করেছো ভাল,' বললাম আমি। 'তাহলে দৌড়াও, নিয়ে এসো কয়েকটা ঝিনুক।'

ছুটলো আর্নেস্ট। জ্যাকও।

জ্যাকই আগে পৌঁছুলো জায়গাটায়। ঝটপট নেমে গেল পানিতে। বড় সড় একটা ঝিনুক তুলে খোলটা আলগা করে ফেললো। ভেতরের জিনিসটুকু ফেলে দিয়ে খোলাটা দিলো আর্নেস্টের কাছে। তারপর আরেকটা তুললো। বেশ কয়েকটা ঝিনুকের খোলা নিয়ে ফিরে এলো ওরা।

এদিকে ফ্রিৎস-এর দেরি দেখে ক্রমে চিন্তিত হয়ে উঠছে এলিজাবেথ। একটু পরেই কাছের এক টিলার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো ফ্রিৎস। হাত দুটো পেছনে, মুখে হতাশ ভঙ্গি।

'কি এনেছো তুমি?' এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো ওর ভাইরা।

'কিচ্ছু না।'

পিচ্চি ফ্রান্সিসই প্রথমে খেয়াল করলো পেছনে কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছে ফ্রিৎস। ও চেঁচিয়ে উঠলো, 'এনেছে! এনেছে!'

ইতিমধ্যে জ্যাক ফ্রিৎসের পেছনে গিয়ে জিনিসটা দেখে ফেলেছে।

'ছোট্ট একটা শুয়োর! ছোট্ট একটা শুয়োর!' লাফাতে লাফাতে ও বললো।

মৃদু হেসে জিনিসটা এবার সামনে আনলো ফ্রিৎস। চিনতে পারলাম, ভ্রমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বইয়ে এর ছবি দেখেছি। শুয়োর নয়, আসলে জন্তুটার নাম আগোটি।

'কোথায় পেলে ওটা? কি করে ধরলে? দৌড়ে পালায়নি?' কল্‌কলিয়ে উঠলো ফ্রান্সিস, জ্যাক আর আর্নেস্ট।

'ওদিকে একটা ছোট্ট নদী আছে। ঐ নদীর পাড় থেকে ধরেছি,' বললো ফ্রিৎস। 'আহ্! ওদিকটা যা সুন্দর, একবার যদি দেখতে, মা! কত গাছপালা! ঘাসে ছাওয়া জমি! নদী যেখানে সাগরে পড়েছে সেখানে কি সুন্দর সৈকত! সেখানে পড়ে আছে অনেক বাক্স, সিন্দুক, তক্তা।' এবার আমার দিকে ফিরলো ও। 'আমার মনে হয়, এক্ষুণি গিয়ে ওগুলো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলা উচিত, জোয়ারের সময় আবার ভেসে যেতে পারে।'

'ঠিক আছে, যাওয়া যাবে। আগে বলো, আমাদের জাহাজের নাবিক-খালাসীদের কারো খোঁজ পেয়েছো?'

'না। কোনো মানুষের ছায়াও নজরে পড়েনি।'

গম্ভীর হয়ে গেলাম আমি। হয় নৌকাসহ ডুবে গেছে, নয়তো অন্য কোনো দ্বীপে গিয়ে উঠেছে নাবিকরা। কাছাকাছি কি আরো দ্বীপ আছে?

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আজ আর কোনো কাজ নয়। খেয়েদেয়ে শোয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলাম আমরা।

BanglaBook.org

তিন

ভোরে সূর্য ওঠার আগেই মোরগের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল আমার। উঠে এলিজাবেথকে জাগালাম। ছেলেদের ওঠালাম না। এখনো সূর্য উঠতে বেশ দেরি। ততক্ষণ ঘুমাক ওরা। দু'জনে আলাপ করে ঠিক করে ফেললাম, আজ কি কি করবো। দু'জনেই একমত হলাম, প্রথম কাজ হচ্ছে জাহাজের আর কেউ এ দ্বীপে এসে উঠেছে কি-না তার খোঁজ নেয়া। তাছাড়া চারপাশটা ঘুরে ফিরে দেখাও দরকার। কতদিন এ দ্বীপে থাকতে হবে কিছু ঠিক নেই। বাস করার জন্যে আরো

ভালো কোনো জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। ফ্রিৎস-এর সেই ঘাসে ছাওয়া গাছপালা ঘেরা জায়গাটা কেমন দেখা উচিত।

এলিজাবেথ বললো, 'আমার মনে হয় সবার যাওয়া ঠিক হবে না; কোথায় কি বিপদ ওত পেতে আছে কে জানে?'

'ঠিক। আমি আর ফ্রিৎস যাবো। ছোট তিনটেকে নিয়ে তুমি থাকবে এখানে।'

মাথা কাত করে সম্মতি জানিয়ে সে বললো, 'ঠিক আছে, তুমি ছেলেদের জাগাও, ততক্ষণে আমি নাশ্‌তা তৈরি করে ফেলি। সেই চিংড়িটা কই?'

'তা তো জানি না, জ্যাকই বলতে পারবে কোথায় রেখেছে।'

খুব একটা ডাকাডাকি করতে হলো না, উঠে পড়লো ছেলেরা। এমন কি কুঁড়ের বাদশা আর্নেস্ট পর্যন্ত একবার ডাকতেই জেগে গেল। জ্যাককে জিজ্ঞেস করলাম, চিংড়িটা কোথায়। এক ছুটে গিয়ে ও নিয়ে এলো সেটা পাশের ছোট একটা টিলার ওপর থেকে।

'টার্ক আর পনটো যাতে খেয়ে ফেলতে না পারে সেজন্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম,' বললো ও।

'বেশ বেশ, জ্যাক,' বললাম আমি। 'কিছু যদি মনে না করো, ফ্রিৎসকে দেবে ওটা? একটু পরেই বেরোবো আমরা, ফিরতে কতক্ষণ লাগবে ঠিক নেই, দুপুরে খেতে পারবে ও।'

'কোথায় যাবে?' হৈ-চৈ করে উঠলো ওরা। 'আমরাও যাবো! আমরাও যাবো!'

'উঁহুঁ, তোমাদের সবাইকে নেয়া যাবে না।' শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিমর্ষ হয়ে গেল আর্নেস্ট, জ্যাক আর ফ্রান্সি। পরিস্থিতিটা ওদের বুঝিয়ে বললাম আমি, 'আশপাশের অবস্থাটা ঘুরে ফিরে দেখতে হবে। কোথাও কোনো বিপদ ওত পেতে আছে কি না জানি না, এই অবস্থায় সবার যাওয়া ঠিক হবে না। শুধু আমি আর ফ্রিৎস থাকলে বিপদ সামাল দেয়া সহজ হবে। তাছাড়া এত জন গেলে খুব দ্রুত এগোতে পারবো না আমরা। তোমরা তিনজন তোমাদের মায়ের কাছে থাকবে। এখন পর্যন্ত যতটুকু বুঝতে পারছি, এ জায়গাটা মোটামুটি নিরাপদ। পনটো থাকবে তোমাদের সাথে, টার্ককে নিয়ে যাবো আমরা। ফ্রিৎস, ঝটপট তুমি বেঁধে ফেল পনটোকে, নইলে ও-ও রওনা হবে আমাদের পেছন পেছন। আর খেয়াল রাখো, টার্ক যেন কাছাকাছি থাকে, নইলে রওনা হওয়ার সময় খামোকা দেরি হবে। আর হ্যাঁ, বন্দুকগুলোতে গুলি বারুদ ভরে ফেল।'

একটু পরেই গরম সুপ আর বিস্কুট দিয়ে নাশ্‌তা করে রওনা হলাম আমরা। একটা করে ঝোলা আর ছোট কুঠার নিয়েছি দু'জনেই। বন্দুক ছাড়াও ফ্রিৎস-এর কোমরে ঝুলিয়ে দিয়েছি দুটো পিস্তল, আমি নিজেও নিয়েছি দুটো। ঝোলায় ভরে নিয়েছি সেদ্ধ চিংড়ি মাছটা, কিছু বিস্কুট আর এক বোতল পানি।

ফ্রিৎস-এর মা-কে বলে গেলাম, ছেলেদের নিয়ে সব সময় যেন নৌকার কাছাকাছি থাকে। সম্ভাবনা যদিও প্রায় শূন্য তবু যদি অপ্রত্যাশিত কোনো বিপদ এসেই পড়ে নৌকায় উঠে কূল থেকে দূরে সরে গেলেই হবে। বাকি বন্দুকগুলোও বারুদ-গুলি ভরে রেখে গেলাম ওদের কাছে।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণের ভেতর আমরা পিতা-পুত্র পৌঁছে গেলাম নদীর কাছে। ছোট নদী। সম্ভবত গভীরও খুব বেশি নয়। এপারে রুক্ষ পাহাড়ী জমি ছাড়া আর কিছু নেই। ওপারে গাছপালা আছে, মাটিও পাহাড়ী নয়। নদী পেরোনোর সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। কিন্তু দু'দিকেই পাড় এমন খাড়া ভাবে নেমে গেছে যে এখান দিয়ে পেরোনোর কথা ভাবতেও পারলাম না। পাড় ধরে হাঁটতে লাগলাম আমি আর ফ্রিৎস।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর এক জায়গায় একটা জলপ্রপাত মতো দেখা গেল। উঁচু পাহাড় থেকে ঝিরঝিরে ধারায় পানি পড়ছে নদীতে। নদীর গভীরতা খুব কম এখানে। পাড়ও তত উঁচু নয়। প্রচুর ছোট বড় পাথর ছড়িয়ে আছে নদীতলের ওপর। নদীর কিনারে নামলাম আমরা। পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেলাম ওপারে।

তারপর আবার হেঁটে চলা। বুক সমান উঁচু ঘাস আর ঝোপ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ পেছনে খসখস একটা আওয়াজ শুনে চমকে থেমে দাঁড়ালাম আমি। ফ্রিৎসকেও ইশারা করলাম থামতে। বেশ কিছুটা পেছনে ঘাস ঠেলে ঠেলে কি যেন একটা আসছে। শঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি। হয় কোনো সরীসৃপ, অথবা বাঘ, নয় তো অন্য কোনো হিংস্র জন্তু! কাঁধ থেকে বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়ালাম আমি। ফ্রিৎস-এর সাহস দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ভয় তো পায়ইনি, আমার অনুকরণে ও-ও বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়িয়েছে।

খসখস আওয়াজটা কাছে এসে গেছে। আমরাও তৈরি। জন্তুটার চেহারা দেখার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবো।

বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল চেপে বসেছে আমার। পর মুহূর্তে বুক সমান উঁচু ঘাসের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো জন্তুটা। হো-হো করে হেসে উঠলাম আমি। ফ্রিৎস-ও। বন্দুক নামিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম। ঝাঁপিয়ে আমাদের ওপর এসে পড়লো টার্ক। আসবার সময় তাড়াহুড়োয় একদম ভুলে গিয়েছিলাম ওর কথা। বোধ হয় পরে আমাদের পেছন পেছন ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে আর্নেস্ট বা এলিজাবেথ।

টার্ককে একটু আদর করে আবার এগোলাম আমরা। পেছনে থেকে অনুসরণ করলো কুকুরটা। একটু পরেই সাগর তীরে পৌঁছে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও জাহাজের সঙ্গীদের কাউকে পেলাম না। নৌকার কোনো ভাঙা টুকরো; বা তাদের কোনো কাপড়চোপড়ও চোখে পড়লো না। বিমর্ষ মনে আবার রওনা হলাম আমরা।

এখন আমাদের বাঁয়ে সাগর, ডানে প্রায় আধ লিগ (১ লিগ প্রায় তিন মাইল) দূরে উপকূলের সমান্তরালে এক সারি পাহাড়। যেখানে আমরা নদী পার হয়েছি সেখানকার সেই পাহাড় শ্রেণী-ই চলে এসেছে এ পর্যন্ত। উপকূল ধরে প্রায় দু'লিগ যাওয়ার পর একটা বনের ধারে পৌঁছুলাম আমরা। বনে বেশির ভাগই নারকেল গাছ। সাগর তীর থেকে ডাঙার কিছুটা ভেতরে বনের প্রান্ত। এখানে একটা গাছের ছায়ায় বসলাম আমি আর ফ্রিৎস। মাথার প্রায় ওপরে উঠে এসেছে সূর্য। একটানা এতক্ষণ হেঁটে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন একটু বিশ্রাম না

BanglaBook.org

নিলেই নয়। কিছু খেয়ে নেয়া-ও দরকার।

ঝোলার ভেতর থেকে বিস্কুট আর সেদ্ধ চিংড়িটা বের করে আমরা খেলাম, টার্ককে দিলাম; তারপর পানি খেয়ে আবার রওনা। বনের ভেতর ঢুকলাম। মাথার ওপরে, ডানে, বাঁয়ে, সামনে অসংখ্য পাখি। অনাহূত অতিথিদের আগমনে বিরক্ত হয়ে একবার উড়ছে, একবার বসছে আর সমানে কিচিরমিচির করছে।

কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো ফ্রিৎস।

'বাবা! একটা বানর দেখলাম ঐ গাছটায়!'

'তাই নাকি?'

এতক্ষণ আমারও মনে হচ্ছিলো শুধু পাখি নয়, আরো কিছু আছে গাছের ডালে, নইলে অমন ব্যস্ত ভঙ্গিতে লাফালাফি করতো না টার্ক। অন্য একটা গাছে আরেকটা বানর দেখেই ছুটলো সেদিকে ফ্রিৎস। তিন চার পা যাওয়ার পরই কিছু একটায় পা বেধে হোঁচট খেলো ও। যেটায় পা বেধেছে সেটা গোল মতো একটা জিনিস।

'এটা আবার কি?' আঙুলের ইশারায় আমাকে দেখালো ও জিনিসটা।

'চেনো না! বইতে ছবিও দেখনি? নারকেল। ভাঙো। দেখো, ভেতরে কি সুন্দর মিষ্টি পানি!'

কুড়ালের সাহায্যে খোসা ছাড়িয়ে ভাঙলাম আমরা নারকেলটা। সুস্বাদু পানি খেয়ে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলো ফ্রিৎস, 'চমৎকার স্বাদ তো, বাবা!'

'হ্যাঁ, শাঁসটা খেয়ে দেখ, আরো মজা।'

নারকেলের শাঁস এবং পানি খেয়ে আবার রওনা হলাম আমরা। বনের ডাল, লতা-পাতা কেটে পথ করে এগিয়ে চললাম। একটা সমান ফাঁকা জায়গায় এসে শেষ হয়ে গেল নারকেল বন। ফাঁকা জায়গাটার ডান পাশ দিয়ে আবার বনে ঢুকলাম আমরা। বনের এদিকটায় নারকেল গাছের চেয়ে অন্য গাছের সংখ্যাই বেশি। কিছুদূর এগোনোর পর এক জায়গায় অদ্ভুত এক ধরনের গাছ দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গাছগুলোর কাণ্ড থেকে ফল বেরিয়েছে। দেখতে ঠিক লাউ-এর মতো।

এগিয়ে গিয়ে একটা ফল হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখলাম। শক্ত খোলস। তার মানে পাকা। ছুরি দিয়ে একটা কেটে নিলাম গাছ থেকে। ফলের মাঝ বরাবর ছুরি চালিয়ে চিরে ফেলার চেষ্টা করলাম। লাভ হলো না। অনেক শক্ত। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়–এই ফলের খোলা দিয়ে তো কিছু বাসন পেয়ালা বানিয়ে নেয়া যায়! সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেলাম। ফ্রিৎস অবাক চোখে দেখতে লাগলো আমার কাণ্ড।

বেশ কয়েকটা ফল পেড়ে নিলাম। নিচের দিকের গোল অংশটা, নারকেল যেমন করে কাটে তেমন বারবার ছুরির ধীর অথচ নির্দিষ্ট মাপের কোপ দিয়ে কেটে ফেললাম। এক সময় আস্তে খসে এলো তলাটা–কোনা উঁচু থালার মতো দেখাচ্ছে এখন ওটা। একই ভঙ্গিতে কেটে আরো কয়েকটা থালা এবং বাটি বানিয়ে সেগুলোর ভেতর দিক ভালো মতো পরিষ্কার করে শুকাতে দিলাম রোদে। ফ্রিৎস এর দিকে ফিরে বললাম, 'চলো। এগুলো আপাতত এখানেই থাক।

BanglaBook.org

যাওয়ার সময় নিয়ে যাবো। সুপ বা নাশতা খেতে আর অসুবিধা হবে না আমাদের।'

কিছুদূর যাওয়ার পর একটা ঢালু পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছুলাম। দ্বীপের চারপাশ পরিষ্কার দেখতে পাবো ভেবে উঠতে শুরু করলাম ঢাল বেয়ে।

খুব বেশি সময় লাগলো না পাহাড়টায় উঠতে। তারপরই অভূতপূর্ব একটা দৃশ্য ভেসে উঠলো চোখের সামনে। নিচে, বহুদূরে শুয়ে আছে শান্ত, নীল সাগর; তার কূল পর্যন্ত বিছিয়ে আছে সবুজ সমভূমি। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে বনের ভেতর দিয়ে এসেছি সেটা। বিস্তৃত একটা জায়গায় অসংখ্য ঝোপ যেন গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের জাহাজী সঙ্গীদের কাউকে দেখলাম না। জ্যাকের দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে ভালো করে খুঁজলাম। কিন্তু না, কোনো দিকেই তাদের কোনো চিহ্ন নেই। মনটা খারাপ হয়ে গেল। একটু আগে পর্যন্ত ক্ষীণ একটা আশা ছিলো, বেশি না হোক, নাবিকদের দু'চারজন অন্তত এসে উঠতে পেরেছে দ্বীপে। এবার নিশ্চিত হয়ে গেলাম, এ দ্বীপে ওঠেনি ওরা। হয় সাগরে ডুবে গেছে, নয়তো অন্য কোনো দ্বীপে (তেমন কোনো দ্বীপ যদি থেকে থাকে আশেপাশে) উঠেছে। এ দ্বীপে যে লোক বসতি আছে তেমন কোনো চিহ্নও নজরে পড়লো না।

আর দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হয় না। নামতে শুরু করলাম পাহাড় থেকে। যেদিক দিয়ে উঠেছি সেদিক দিয়েই। উঠতে যতটা লেগেছিলো নামতে তারচেয়ে অনেক কম লাগলো সময়। প্রায় দৌড়ে নেমে এলাম আমরা ঢাল বেয়ে। পাহাড় থেকে নামার আগেই নারকেল বনটার অবস্থান দেখে নিয়েছি। কোনাকুনি এগোলাম সেদিকে। অর্থাৎ যে পথে এসেছিলাম ঠিক সেপথে ফিরছি না আমরা।

কিছুদূর যাওয়ার পরই এমন এক জায়গায় পৌঁছুলাম যেখানে বড় গাছ প্রায় নেই বললেই চলে। এক বা দু'ইঞ্চি মোটা নলখাগড়ার মতো এক ধরনের গাছ ঘন হয়ে জন্মেছে। বেশ লম্বা গাছগুলো। সাবধানে এগোলাম আমরা। ভয় হচ্ছে, সাপ বা সরীসৃপ জাতীয় কোনো প্রাণীর গা মাড়িয়ে না দেই। সেক্ষেত্রে প্রাণীটাও ছেড়ে কথা কইবে না। নির্ঘাত ছোবল বসাবে। টার্ককে আগে আগে যেতে দিলাম, যাতে তেমন বিপজ্জনক কিছু দেখলে আগেই আমাদের সতর্ক করতে পারে।

ছুরি দিয়ে মোটা ডাঁটার মতো গাছগুলো কেটে কেটে পথ করে এগোচ্ছি। কাটার সাথে সাথে স্বচ্ছ রস বেরিয়ে আসছে। একটা গাছ কাটার সময় হঠাৎ খানিকটা রস এসে পড়লো আমার হাতে। কৌতূহলী হয়ে সাবধানে জিভের ডগা ছোঁয়ালাম হাতে লেগে থাকা রসে। মিষ্টি লাগলো। চমৎকার তাজা একটা গন্ধও পেলাম। বুঝে গেলাম জিনিসটা কি। প্রাকৃতিক একটা আখ খেতের ভেতর দিয়ে চলেছি আমরা। ফ্রিৎসকে কিছু বললাম না এ সম্পর্কে। ভাবলাম, ও নিজেই আবিষ্কার করুক ব্যাপারটা।

একটু পরে ফ্রিৎসকে বললাম, 'সাপখোপের হাত থেকে বাঁচতে হলে বন্দুকে চলবে না, লাঠি জাতীয় কিছু থাকা দরকার সঙ্গে। একটা গাছ কেটে লাঠি বানিয়ে নাও।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় গোড়া থেকে ও কেটে নিলো একটা গাছ। আগার দিকের

পাতাগুলো ছেঁটে ফেলে দিলো। এরপর ওটার সাহায্যেই দু'পাশের গাছ ঠেলে পথ করে এগোতে লাগলো। নাড়াচাড়ার ফলে লাঠি থেকে প্রচুর রস গড়িয়ে পড়লো ফ্রিৎসের হাতে। ব্যাপার কি পরীক্ষা করার জন্যে থেমে দাঁড়ালো ও! উঁচু করে ধরলো আখটা। আরো রস বেরিয়ে এলো। আমার মতো কৌতূহলী হয়ে ও-ও আঙুলে লেগে থাকা রস জিভ দিয়ে চেটে দেখলো। পরমুহূর্তে বিস্মিত চিৎকার:

'বাবা, বাবা! দেখ কি পেয়েছি! চিনির ঝোল! নিশ্চয়ই এটা আখ!' বলেই আর কথা নেই, দাঁত দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে ও খেতে শুরু করলো আখটা।

ফ্রিৎসের লোভীর মতো ভঙ্গি দেখে হেসে ফেললাম আমি। ঝটপট আখটা শেষ করে ফেলে ও বললো, 'কয়েকটা কেটে বাসায় নিয়ে যাবো। মা, ফ্রান্সিস, আর্নেস্ট, জ্যাক সবাই খুব খুশি হবে; কি বলো, বাবা?'

'নিশ্চয়ই। তবে খুব বেশি নিও না, বাসা এখনো অনেক দূর, বেশি বোঝা নিয়ে অতদূর হাঁটতে পারবে না।'

বৃথাই ওকে সাবধান করলাম। কয়েক মিনিটের ভেতর অন্তত এক ডজন সবচেয়ে লম্বা আর মোটা আখ কেটে পাতা ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে তৈরি করে ফেললো ফ্রিৎস। ওগুলো বগলদাবা করে রওনা হলো আমার পিছু পিছু।

আখ বন থেকে বেরিয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে আমরা নারকেল বনে ঢুকলাম। তার আগে লাউ-এর মতো ফল কেটে বানানো বাসন পেয়ালাগুলো নিয়ে এলাম পাশের জঙ্গলে ঢুকে। ওগুলো আমার কাঁধের ঝোলায় ভরে এগোলাম। নারকেল বনে ঢুকে বিশ্রাম নিতে একটা গাছের ছায়ায় বসলাম। বসতে না বসতেই শুনলাম তীব্র কিচির মিচির আওয়াজ। টার্কও ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করেছে। গাছের মাথার দিকে ওর চোখ। টার্ক-এর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখলাম প্রতিটি নারকেল গাছে অসংখ্য বানর। আতঙ্কিত হয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে, সেই সাথে প্রাণপণে কিচির মিচির। আমাদের দেখে আর টার্ক-এর ঘেউ ঘেউ শুনে প্রাণ উড়ে গেছে বেচারাদের। গাছের একেবারে মাথায় চড়ে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইলো ওরা আমাদের দিকে। ফ্রিৎস উঠে দাঁড়িয়ে বন্দুক তাক করলো।

'এই, করছো কি, ফ্রিৎস?' চেঁচালাম আমি।

'মারি দু একটা!' জবাব দিলো ও।

'কেন? খামোকা মারবে কেন? এমনিতেই ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। তাছাড়া তোমার কোনো ক্ষতি তো করেনি ওরা।'

একটু থমকালো ফ্রিৎস। বন্দুকটা নামিয়ে ফেললো ধীরে ধীরে।

'তারচেয়ে এসো, ওদের দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেই,' বললাম আমি।

'কি করে?'

'এখুনি দেখতে পাবে। তুমি ঐ গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াও, আমি আসছি।' বলেই বেশ কয়েকটা পাথর তুলে নিয়ে এলোপাতাড়ি ছুঁড়তে শুরু করলাম বানরগুলোর দিকে। এতে খেপে গেল ওরা। ডাব, নারকেল, হাতের কাছে যে যা পেলো গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল আমাকে লক্ষ্য করে। এক ছুটে ফ্রিৎস-এর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। টার্ককেও ডেকে নিলাম

নিজেদের কাছে।

একটু পরে থামলো নারকেল-বৃষ্টি। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে দেখলাম, অসংখ্য নারকেল, ডাব ছড়িয়ে রয়েছে মাটিতে। উপর দিকে মুখ তুলে তাকালাম। এখন আর আতঙ্কিত নয়, হিংস্র দেখাচ্ছে বানরগুলোর চেহারা। জন্তুগুলোকে আর ঘাঁটানো সমীচীন মনে করলাম না। আমাদের পক্ষে যতগুলো বয়ে নেয়া সম্ভব তাড়াতাড়ি ততগুলো নারকেল কুড়িয়ে নিয়ে কেটে পড়লাম।

বানরগুলোর আওতা থেকে সরে এসে আবার বসলাম আমরা। এবার একটু নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নিতে চাই। আগেরবার যেটা খেয়েছিলাম সেটা ছিল ঝুনো; এবার একটা কচি নারকেল–অর্থাৎ ডাব কাটলো ফ্রিৎস। পানিটুকু খেয়ে নেয়ার পর কুড়ালের এক কোপে খোলাটা দু'ভাগ করে ফেললো। মাখনের মত নরম সর শক্ত নারকেলের চেয়ে অনেক মজা লাগলো খেতে। ফ্রিৎস একাই গোটা চারেক ডাবের সর খেলো।

ডাবের তাজা পানি খেয়ে ক্লান্তি প্রায় দূর হয়ে গেছে। আবার রওনা হলাম আমরা। দিনের আর বেশি বাকি নেই। এবার দ্রুত না হাঁটলে সন্ধ্যার আগে তাঁবুতে পৌঁছুতে পারবো না।

BanglaBook.org

চার

একটু পরেই আবার থামতে হলো। ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে ফ্রিৎস।

'ভাবতে পারিনি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও, 'কয়েকটা আখের এত ওজন হবে। ওরা খুব খুশি হবে ভেবে এনেছিলাম। এখন তো মনে হচ্ছে ফেলে যেতে হবে!'

'ধৈর্য ধরো, ফ্রিৎস, আর বুকে একটু সাহস আনো,' জবাব দিলাম আমি। 'প্রথমেই তো বলেছিলাম, এত এনো না। যাক, এনেই যখন ফেলেছো, একটা বুদ্ধি দিচ্ছি, দেখ কাজ হয় কি-না। পথে যেতে যেতে আমরা খেয়ে কয়েকটা কমিয়ে দেবো। এখনই একটা দাও আমাকে, তুমিও একটা নাও। বাকিগুলো বেঁধে বন্দুকের সঙ্গে পিঠে ঝুলিয়ে নাও। অনেক সহজে বইতে পারবে।'

পরামর্শ মতো কাজ করলো ফ্রিৎস। আখ চিবুতে চিবুতে রওনা হলাম আমরা। সত্যিই এবার আর তত কষ্ট হচ্ছে না ফ্রিৎস-এর আখগুলো বইতে।

নারকেল বন শেষ হতে আর বেশি বাকি নেই; এমন সময় আচমকা এক লাফ দিয়ে ছুটলো টার্ক। সঙ্গে সঙ্গে হাতের নারকেলগুলো নামিয়ে রেখে বন্দুক তুলে নিলাম কাঁধ থেকে। তারপরই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। আমাদের কিছু সামনে একদল বানর মনের আনন্দে লাফালাফি করছিলো মাটিতে। আমরা খেয়াল করিনি, বানরগুলোও খেয়াল করেনি আমাদের। কিন্তু টার্ক ঠিকই খেয়াল করেছে এবং সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেগুলোর ওপর। মুহূর্তে হৈ-চৈ ছুটোছুটি পড়ে গেল বানরগুলোর ভেতর। বেশির ভাগই লাফিয়ে উঠে গেল কোনো না কোনো

গাছে। বাচ্চা কোলে এক মাদী বানর পারলো না পালাতে। টার্কের চিৎকারে আতঙ্কিত হয়ে বাচ্চাটা এমন জোরে মায়ের গলা আঁকড়ে ধরলো যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরার অবস্থা হলো মা বানরটার। না পারলো ছুটতে, না পারলো লাফিয়ে কোনো গাছে উঠতে। ছুটে গিয়ে টার্ক কামড় বসিয়ে দিলো তার ঘাড়ে। ঝাঁকুনি দিলো, ছিঁড়ে ফেলতে চাইলো তীব্র রোষে।

বানরটাকে বাঁচানোর জন্যে ছুটলো ফ্রিৎস। কাঁধে, হাতে যা যা ছিলো সব মাটিতে ফেলে দৌড়ে গেল টার্কের দিকে। কিন্তু ও পৌঁছুনোর আগেই ভবলীলা সাঙ্গ হলো বানরটার।

এরপর ঘটলো অদ্ভুত এক মজার ঘটনা। বানর বেচারী মারা যাওয়ার পরও বাচ্চাটা তার গলা জড়িয়ে ধরে ছিলো। কিন্তু ফ্রিৎস এগিয়ে যেতেই এক লাফে সে উঠে পড়লো ওর মাথায়। চার হাত পায়ে চুল আঁকড়ে ধরলো।

একই সঙ্গে আতঙ্ক আর ব্যথায় চিৎকার করে উঠলো ফ্রিৎস। সেই সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে চেষ্টা করতে লাগলো বানরের বাচ্চাটাকে ফেলে দিতে। কিন্তু নাছোড়বান্দার মতো ওর চুল ধরে আছে বাচ্চাটা। হো হো করে হেসে উঠে আমি এগিয়ে গেলাম ফ্রিৎস-এর দিকে।

'লাভ নেই, ফ্রিৎস,' বললাম আমি। 'যতই মাথা ঝাঁকাও না কেন, ও নামবে না। তোমাকে বোধ হয় ওদের পরিবারের কর্তা মনে করেছে।'

'ওহ্, বাবা, আমার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেললো, সরাও এটাকে!'

সাবধানে আমি দু'হাতে ধরলাম বানরের বাচ্চাটাকে। আস্তে টেনে ছাড়িয়ে আনলাম ফ্রিৎস-এর মাথা থেকে। ছোট্ট তুলতুলে বাচ্চাটার ওপর খুব মায়া হলো। এখানে ফেলে রেখে গেলে হয়তো না খেয়েই মারা যাবে। কি করবো ভাবছি, এমন সময় চিৎকার করে উঠলো ফ্রিৎস–

'একে আমরা বাড়ি নিয়ে যাই, বাবা! আমি পুষবো! যতদিন না আমাদের গরু-ছাগল তীরে আনতে পারছি ততদিন আমার ভাগের নারকেলের পানি খাওয়াবো ওকে।'

'কোনো আপত্তি নেই,' বললাম আমি। 'ভালো মতো পোষ মানাতে পারলে একদিন হয়তো অনেক উপকারে আসবে,' বলতে বলতে বাচ্চাটা দিয়ে দিলাম ফ্রিৎস এর কাছে। ফ্রিৎস ওটাকে কাঁধে বসানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুতেই রাজি হলো না বাচ্চাটা। কাঁধ আঁকড়ে ধরে ঝুলে রইলো পিঠের ওপর।

আবার রওনা হলাম আমরা। এবার ফ্রিৎস-এর আখের বোঝাটা আমিই ঝুলিয়ে নিয়েছি পিঠে। দশ পনের পা যাওয়ার পর পেছন ফিরে দেখি, টার্ক আসছে না। মজাসে খাচ্ছে নিহত বানরটার কাঁচা মাংস। কয়েকবার ডাকলাম ওর নাম ধরে। গ্রাহ্য করলো না টার্ক। খেয়েই চললো।

আমরা সিকি লিগ পেরোতে না পেরোতেই ছুটতে ছুটতে এসে আমাদের ধরে ফেললো টার্ক। কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগলো ফ্রিৎস-এর পেছন পেছন। ওকে দেখেই আবার আতঙ্কিত হয়ে উঠলো বানর ছানা। তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে চলে গেল ফ্রিৎস-এর পিঠ থেকে বুকে। আবার আমি হেসে উঠলাম হো হো করে। এবার আর সহ্য করতে পারলো না ফ্রিৎস। বানরের বাচ্চাটাকে বুক

BanglaBook.org

থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বসিয়ে দিলো টার্কেরই পিঠে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল টার্কের লাফ ঝাঁপ–পিঠ থেকে ফেলে দেবে বাচ্চাটাকে। বাচ্চাটাও সেয়ানা কম নয়, শক্ত করে খামচে ধরে রইলো টার্কের পিঠ, শত লাফালাফিতেও পড়লো না। তবু ফ্রিৎস নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে একটা দড়ি দিয়ে টার্কের শরীরের সঙ্গে বেঁধে দিলো বাচ্চাটাকে। তারপর বললো–

'জনাব টার্ক, নিষ্ঠুরভাবে এই শিশুর মাকে তুমি হত্যা করেছো, সুতরাং এখন থেকে এর লালন পালনের ভার তোমার।'

আমার পনেরো বছর বয়েসী ছেলের মুখে হঠাৎ এমন একটা কথা শুনে চমকে গেলাম। কে বলবে এই ছেলেই কিছুক্ষণ আগে খামোকা গুলি করে বানর মারতে চেয়েছিলো? আরেকটা দড়ি টার্কের গলায় বেঁধে দিলো ফ্রিৎস। দড়ির প্রান্ত ধরে পেছন পেছন হাঁটিয়ে নিয়ে চললো কুকুরটাকে।

পরিবারের আর সবার সাথে মিলিত হওয়ার আগ্রহে পথ যে কখন শেষ হয়ে গেছে টেরই পাইনি। হঠাৎ খেয়াল করলাম নদীর তীরে পৌঁছে গেছি আমরা। ওপারে দাঁড়িয়ে আছে পনটো। ঘেউ ঘেউ করে আমাদের আগমন সংবাদ ঘোষণা করছে। টার্ক এমন উৎফুল্ল ভঙ্গিতে সাড়া দিলো ওর চিৎকারের যে রীতিমতো অস্থির হয়ে উঠলো তার পিঠের ওপরের ছোট্ট সওয়ারীটা। দড়ির বাঁধন আলগা করে সে এক লাফে উঠে পড়লো ফ্রিৎস-এর কাঁধে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ভড়কে গিয়ে টার্কের গলায় বাঁধা রশিটা ছেড়ে দিলো ফ্রিৎস। সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে এক লাফ দিয়ে ছুটলো টার্ক। ঝপাং ঝপাং শব্দ তুলে নদী পেরিয়ে ছুটে গেল বন্ধুর কাছে।

সারমেয়কুলের এই আচমকা চিৎকারে ঘাবড়ে গিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো ফ্রিৎস-এর মা আর ভাইরা। আমাদের দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো ওরা। আনন্দে চক চক করছে সবার চোখ। নদীর এপারে আমরা, ওপারে ওরা। ধীরে ধীরে হেঁটে চললাম সকালে যেখান দিয়ে পার হয়েছিলাম সে জায়গার দিকে। সকালের মতই সেই জল প্রপাতের সামনে গিয়ে পাথর টপকে টপকে নদী পার হলাম আমরা। মুখে উদ্ভাসিত হাসি নিয়ে ওরা গ্রহণ করলো আমাদের, যেন কতদিন পরে দেখা।

'কি মজা! বানরের বাচ্চা, জ্যান্ত বানরের বাচ্চা!' এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো তিন ছেলে। 'কি করে ধরলে ওকে তোমরা? কেমন উদ্ভট চেহারা দেখেছো!'

'বিচ্ছিরি দেখতে!' বললো পিচ্চি ফ্রান্সিস। বানরের বাচ্চাটাকে ধরার খুব ইচ্ছে ওর, কিন্তু ঠিক সাহস করে উঠতে পারছে না।

'তোমার চেয়ে অনেক সুন্দর, ফ্রান্সিস!' হি-হি করে খানিকটা হেসে জ্যাক বললো। 'দেখ দেখ, হাসছে! কেমন করে খায় দেখতে হবে!'

'আহ্, দু'একটা নারকেল যদি থাকতো আমাদের কাছে!' বললো আর্নেস্ট। 'বাবা, তোমরা খুঁজে পাওনি একটাও?' আমার মাথা ঝাঁকানো দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন খেতে, খুব মজা?'

'আমার জন্যে আনোনি কেন?' অনুযোগ ফ্রান্সিসের গলায়।

'কোনো বিপদে পড়তে হয়নি তো তোমাদের?' জিজ্ঞেস করলো এলিজাবেথ।

সবাই এরকম আরো হাজারটা প্রশ্ন করে চললো। অবশেষে ওরা একটু শান্ত হলে জবাব দেয়ার সুযোগ পেলাম আমি।

'ঈশ্বরের কৃপায় নতুন কোনো দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হয়নি আমাদের। নিরাপদেই ঘুরে-ফিরে দেখে এসেছি চারপাশটা। তোমাদের জন্যে সামান্য কিছু উপহারও আনতে পেরেছি। তবে দুঃখের কথা হলো, আমাদের জাহাজী সঙ্গীদের কারো খোঁজ পাইনি–কোনো চিহ্ন পর্যন্ত না।'

শুনে ওরা দুঃখিত হলো। আমার মতো ওরাও আশা করেছিলো, হয়তো দু'এক জন নাবিক এই দ্বীপে উঠতে পেরেছে।

'সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা,' বলে প্রসঙ্গ বদলালো এলিজাবেথ। 'ওহ্, কি দুশ্চিন্তায় না কাটিয়েছি সারাটা দিন।' প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে, এই বুঝি কোনো বিপদ ঘটলো তোমাদের! দিনটাকে বছরের সমান লম্বা মনে হয়েছে–কাটতেই চায় না! তোমাদের দেখে এখন কি যে খুশি লাগছে, কি বলবো! দাও, জিনিসগুলো আমাদের হাতে দাও; সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত তোমরা–।'

জ্যাক আমার বন্দুকটা নিলো, আর্নেস্ট নারকেলগুলো, ফ্রান্সিস লাউয়ের খোলা আর এলিজাবেথ নিলো কাঁধের ঝোলাটা। ফ্রিৎস আখগুলো ভাগ করে দিলো সবাইকে। বানরের বাচ্চাটাকে আবার বসিয়ে দিলো টার্কের পিঠে। তাঁবুর দিকে এগোলাম আমরা হৈ হৈ করতে করতে।

তাঁবুর কাছে পৌঁছে জিনিসপত্র সব আগে জায়গা মতো রাখলাম। তারপর সবাই গোল হয়ে বসলাম তাঁবুর সামনে। আমি আর ফ্রিৎস সারাদিন কোথায় কোথায় গিয়েছি, কি কি করেছি সব বর্ণনা করলাম। উৎসুক হয়ে শুনলো ওরা। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাতে আলো জ্বালবার কোনো ব্যবস্থা নেই; তাই খেয়ে নেয়ার জন্যে উঠলাম আমরা। আমাদের ছোট্ট রান্নাঘরের কাছে গিয়ে বসলাম আবার।

আমাদের অনুপস্থিতিতে একাই রাতের খাওয়ার যে আয়োজন করেছে এলিজাবেথ, দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। জাহাজ থেকে নিয়ে আসা একটা হাঁস জবাই করে ছিলে-কেটে ঝলসে নিয়েছে আগুনে। একই ভাবে ঝলসানো হয়েছে কয়েকটা মাছ–বোধহয় ছেলেরা ধরেছে ওগুলো। তাছাড়া সুপ তো আছেই। এর সঙ্গে যোগ হলো নারকেল আর আখ। মোট কথা প্রায় রাজকীয় খাবার খেলাম আমরা। খেতে খেতে আলাপ চললো।

'আমরা তো ভাবছিলাম সারাদিন তোমরা বসে বসেই কাটাবে,' বললাম আমি। 'এখন দেখছি, না, তোমরাও কাজের মানুষ। এত কিছু জোগাড়-যন্ত্র করেছো। তবে হ্যাঁ, একটা কথা না বলে পারছি না, এত তাড়াতাড়ি একটা হাঁস কমিয়ে ফেলা উচিত হয়নি। ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগবে ওগুলো–ডিম পাওয়া যাবে।'

হাসলো আমার স্ত্রী, আর্নেস্ট আর জ্যাক। 'তুমি বুঝি ভেবেছো, আমাদের হাঁস মেরেছি? মোটেও তা না। আর্নেস্ট শিকার করে এনেছিলো ওটা।'

'হ্যাঁ, বাবা,' বললো আর্নেস্ট। 'আমার মনে হয় পাখিটা পেঙ্গুইন জাতীয়।

BanglaBook.org

পেঙ্গুইন না বলে ওটার নতুন নামও দিতে পারি আমরা–উজবুক। বুদ্ধি বলতে কিছু নেই মাথায়। লাঠি দিয়ে এক বাড়ি দিয়েছি, ব্যস, কাজ শেষ। আমাকে দেখে পালানো তো দূরের কথা, জায়গা ছেড়ে নড়েনি পর্যন্ত!'

'পাগুলো কেমন ওটার, আর ঠোঁট?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'পা হাঁসের পায়ের মতো পর্দা লাগানো; ঠোঁট লম্বা, সরু আর একটু নিচের দিকে বাঁকানো। ওটার মাথা আর গলা রেখে দিয়েছি আমি।'

'ঠিক আছে পরে দেখবো, তবে মনে হচ্ছে পেঙ্গুইন-ই। এবার এসো দেখি, নারকেলগুলো কি করা যায়। ফ্রিৎস, তুমি তো বেশ পটু হয়ে গেছ, ওদের কেটে দাও একটা একটা করে। আর হ্যাঁ, বানরটার কথা ভুলো না।'

খাওয়া যখন শেষ হলো তখন রাত নেমে আসছে। আর একটু পরেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে যাবে চারদিক। ঝটপট তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়লাম আমরা। বানরটাকেও নিলাম সাথে। ইতিমধ্যে সবকটা ছেলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে ও। ফ্রিৎস আর জ্যাকের ভেতর তো ঝগড়াই লাগে প্রায়, কার কাছে শোবে ও এই নিয়ে। অবশেষে আমার মধ্যস্থতায় শান্ত হলো দু'জন। ঠিক হলো দু'জনের মাঝখানে শোবে বানরছানা।

শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ একথা সেকথা আলাপ করলাম আমরা। এক সময় একটা একটা করে থেমে যেতে লাগলো গলার স্বর। সেখানে শোনা যেতে লাগলো ভারি নিশ্বাসের আওয়াজ। পাশ ফিরে শুলাম আমি। কখন যে ঘুমিয়ে গেছি নিজেও জানি না।

কিন্তু এই আরামের ঘুম খুব বেশিক্ষণ ঘুমাতে পারলাম না। তাঁবুর গায়ে হাঁস-মুরগির নড়া চড়া আর মৃদু কঁক-কঁক, প্যাঁক-প্যাঁক শব্দে জেগে গেলাম। তারপরই শুনতে পেলাম টার্ক আর পনটোর ভয়াবহ গর্জন। বেরিয়ে এলাম তাঁবুর বাইরে। ফ্রিৎস আর এলিজাবেথও জেগেছে। ওরা এলো আমার পেছন পেছন। প্রত্যেকের হাতে বন্দুক।

'দরকার পড়লে গুলি করতে পারবে তোমরা?' ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিলো এলিজাবেথ, 'যদি দরকার পড়ে, অবশ্যই পারবো। অন্তত তোমাদের বন্দুকে গুলি ভরে দিতে তো পারবো।'

'তাহলে আর সময় নষ্ট করে কাজ নেই, চলো, শত্রুর চেহারাটা আগে দেখি।'

মরিয়া হয়ে চিৎকার করছে আমাদের কুকুর দুটো। কিন্তু ওদের দেখা পাচ্ছে না কোথাও।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে খুব বেশি দূরে যেতে পারিনি, এমন সময় চাঁদের আবছা আলোয় দেখতে পেলাম ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা! অন্তত এক ডজন শেয়াল চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে টার্ক আর পনটোকে। একটু পরপরই একটা বা দুটো শেয়াল লাফিয়ে গিয়ে হামলা চালাচ্ছে কুকুর দুটোর ওপর। সাহসের সাথে ওদের মোকাবেলা করছে টার্ক আর পনটো। ইতিমধ্যে তিনটে শেয়ালকে হত্যা করেছে ওরা। কিন্তু তাতে এক বিন্দু দমেনি শেয়ালগুলো। আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে

BanglaBook.org

সমানে।

শেয়ালের চেয়ে ভয়ঙ্কর কোনো প্রাণীর আশঙ্কা করেছিলাম আমি। যখন দেখলাম শেয়াল, তখন অনেকটা স্বস্তি বোধ করলাম।

'শেয়াল বাবাজীদের একটু শিক্ষা দিতে হয়,' বললাম আমি। 'ফ্রিৎস, জলদি, আমরা দুজন এক সাথে গুলি করবো, কিন্তু সাবধান, কুকুরগুলোর গায়ে যেন না লাগে।'

প্রায় একই সঙ্গে গর্জে উঠলো দুটো বন্দুক। আমার হাতের টিপ ভালো, ফ্রিৎস-এরও যে এতটা তা আমার ধারণা ছিলো না। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়লো দুটো শেয়াল। গুলির শব্দেই হোক আর অতিপ্রাকৃত উপায়ে দুই সঙ্গীকে মরতে দেখেই হোক, ভয় পেয়ে পিঠটান দিলো বাকি শেয়াল কটা। লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এলো টার্ক আর পনটো। চারপাশ নিঝুম হয়ে গেল আবার।

'চলো শুয়ে পড়ি,' এলিজাবেথ বললো, 'আশা করি আজ রাতে আর কোনো ঝামেলা হবে না।'

'হ্যাঁ, চলো,' বললাম আমি।

কিন্তু বাধা দিলো ফ্রিৎস। 'আমি যে শেয়ালটা মেরেছি সেটাকে এনে রাখি তাঁবুর সামনে? কাল সকালে ওদের দেখিয়ে চমকে দেবো,' তাঁবুর ভেতরে ঘুমন্ত ভাইদের দিকে ইশারা করলো সে।

অনুমতি পেয়ে ছুটলো ফ্রিৎস। বেশ কষ্ট করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলো মরা জন্তুটাকে। বড় একটা কুকুরের চেয়েও বড় শেয়ালটা।

টার্ক আর পনটোকে একটু আদর করে তাঁবুতে ঢুকলাম আমরা। ছোট তিন ছেলে এখনো নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। কুকুরের গর্জন আর গুলির শব্দে একটুও ব্যাঘাত হয়নি ওদের ঘুমের।

BanglaBook.org

পাঁচ

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। এলিজাবেথকে জাগিয়ে বললাম, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভাঙা জাহাজটায় যাওয়া দরকার। গরু, ছাগল, আর ভেড়াগুলোকে নিয়ে আসা উচিত। কয়েকদিন ধরে ভালো আছে সমুদ্রের অবস্থা, কখন আবার ঝড়-ঝাপটা ওঠে ঠিক নেই। এখুনি যদি ওগুলো নিয়ে না আসি, হয়তো কখনোই আনা হবে না। আবার ঝড় উঠলে জাহাজটা ঘণ্টা খানেকও টিকবে কিনা সন্দেহ।'

'হুঁ, জানি,' বললো আমার স্ত্রী। 'কিন্তু আবার ওই জাহাজে যাওয়ার কথা ভাবলেই আমার গা শিউরে ওঠে।'

'তোমাকে যেতে হবে না। আমি আর ফ্রিৎস শুধু যাবো। ছোট তিনটেকে নিয়ে তুমি এখানেই থাকবে।'

'আমি বুঝি খালি আমাকে নিয়েই দুশ্চিন্তা করি?'

'না না, তা বলছি না। তবে কথা হলো আমরা এমন একটা অবস্থায় পড়েছি

যে ওসব দুশ্চিন্তা-টুশ্চিন্তা মাথায় না আনাই ভালো। প্রচুর কাজ সামনে। কতদিন এখানে থাকতে হবে কিছু ঠিক নেই। যত বেশি সম্ভব জিনিস জাহাজ থেকে নিয়ে আসতে পারলে অনেকখানি সহজ হয়ে যাবে আমাদের জীবন যাত্রা।'

'জানি। তবু তোমাদের ওখানে যেতে দিতে ভয় করে। যাকগে, ভয় করুক না-ই করুক, যা করতে হবে, তা তাড়াতাড়ি করে ফেলাই ভালো।'

'এই তো বুঝেছো। চিন্তা কোরো না, আমরা ঠিক মতোই ফিরে আসবো।'

এরপর ছেলেদের ডাকলাম। উঠে পড়লো ফ্রিৎস। বাকি তিনটে ঘুম তাড়ানোর জন্যে চোখ ডলে হাই তুলতে লাগলো। লাফিয়ে তাঁবুর বাইরে চলে গেল ফ্রিৎস। ওর এই ব্যস্ততার কারণ বুঝতে অসুবিধে হলো না, রাতে ও যে শেয়াল মেরেছে সেটা এখনো জায়গা মতো আছে কিনা দেখতে গেল।

একটু পরে আর্নেস্ট, ফ্রান্সিস আর জ্যাকও বেরিয়ে এলো তাঁবুর বাইরে, পেছনে আমি। হলদে রঙের জন্তুটা দেখে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেল ওরা। তিনজনই যেন জমে গেল তাঁবুর সামনে।

'ও মা!' ফ্রান্সিসই কথা বলল প্রথম, 'এ যে দেখছি নেকড়ে বাঘ!'

'না না,' কাছে গিয়ে শেয়ালটার একটা থাবা তুলে নিলো জ্যাক, 'নেকড়ে না, কুকুর! হলদে রঙের কুকুর! মরে গেছে।'

'উঁহুঁ, কুকুরও না নেকড়েও না।' এবার আর্নেস্ট। 'এটা হলো সোনালি শেয়াল!'

'হ্যাঁ, রাত্রে আমি নিজে মেরেছি ওটা,' বললো ফ্রিৎস।

'তুমি মেরেছো? রাত্রে? নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে?'

'না, মিস্টার আর্নেস্ট, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নয়, রীতিমতো জেগে, এবং বন্দুক দিয়ে গুলি করে। যাহোক, রাতে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, সে সময় যারা ঘুমিয়ে কাটায় তাদের সাথে তর্ক করতে চাই না আমি।'

'হয়েছে হয়েছে, আর ঝগড়া নয়,' আমি বললাম। 'ফ্রিৎস ঠিকই বলেছে।'

রাতের ঘটনা আমি খুলে বললাম ওদের। চোখ বড় বড় করে শুনলো ওরা। তারপর হাজার প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো আমাকে আর ফ্রিৎসকে। ধৈর্যের সঙ্গে ওদের প্রশ্নের জবাব দিলাম আমরা।

ইতিমধ্যে নাশতা তৈরি করে ফেলেছে ওদের মা। মুখ হাত ধুয়ে এসে খেতে বসে গেলাম সবাই। খেতে খেতে বললাম আজকের পরিকল্পনার কথা। লাফিয়ে উঠলো চার ভাই– 'আমরাও যাবো।'

'উঁহুঁ, আজও তোমাদের নিরাশ করতে হচ্ছে,' ছোট তিনজনের দিকে তাকিয়ে বললাম। 'শুধু ফ্রিৎস যাবে আমার সঙ্গে। তোমাদের চারজনের ভেতর ও বড়, গায়ে শক্তিও তোমাদের তিন জনের চেয়ে বেশি। আপাতত ওকেই আমার এক নম্বর অনুচর হিসেবে মনোনীত করেছি। তোমরা তিনজন এখানে থাকবে মায়ের কাছে। আশা করি মায়ের কথা মেনে চলবে সবাই।'

খেয়ে উঠেই আমরা লেগে গেলাম রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিতে। আমাদের সেই অভিনব নৌকাটাকে যাত্রার উপযোগী করে তুলতে লাগলো ফ্রিৎস। এই ফাঁকে আমি একটা লম্বা লাঠি জোগাড় করে পুঁতে ফেললাম মাটিতে। আন্দাজ

BanglaBook.org

করে এমন জায়গায় পুঁতলাম যেন জাহাজ থেকে দেখা যায় ওটা। এক টুকরো সাদা লিনেন পতাকার মতো করে বেঁধে দিলাম লাঠির মাথায়। পতাকাটা সংকেতের কাজ করবে।

'এখানে যদি কোনো বিপদ হয় তোমাদের,' এলিজাবেথকে বললাম, 'লাঠির মাথা থেকে পতাকাটা তুলে নেবে আর তিনবার ফাঁকা আওয়াজ করবে বন্দুকের। সংকেত পেলেই ফিরে আসবো আমরা। সম্ভবত আজ রাতটা জাহাজেই কাটাতে হবে আমাদের। ওখানে করার এত কিছু রয়েছে, দিনে দিনে বোধ হয় ফিরে আসতে পারবো না।'

'আর তোমরা যদি বিপদে পড়ো?' জিজ্ঞেস করলো এলিজাবেথ।

'সে সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। তবু যদি তেমন কিছু ঘটেই গুলি ছুঁড়ে সংকেত দেবো।' অবশ্য তাতে কোনো লাভ হবে না। আমরা বিপদে পড়লে ওরা ডাঙায় থেকে কি সাহায্য করবে? তবু প্রতিশ্রুতি দিয়ে নৌকায় উঠে পড়লাম। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে ফ্রিৎস। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মানে আমাদের বন্দুক, গুলি আর কিছু বারুদ। খাবার দাবার আশা করছি জাহাজেই পাবো প্রচুর পরিমাণে। এছাড়া ফ্রিৎস বানরছানাটাকে নিয়েছে সঙ্গে। আমি আপত্তি করিনি।

নিঃশব্দে নৌকা ভাসিয়ে দিলাম আমরা। আর্নেস্ট, জ্যাক, ফ্রান্সিস আর ওদের মা দাঁড়িয়ে রইলো তীরে। যতক্ষণ আমাদের দেখতে পেলো ততক্ষণ নড়লো না ওরা। আমি আর ফ্রিৎস-ও একটু পরপরই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল ওরা।

এবার পরিপূর্ণভাবে আমরা মনোযোগ দিলাম নৌকা বাওয়ার কাজে। খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর খেয়াল করলাম, সামান্য ডান দিকে আরেকটা খাঁড়ির মতো। একটু ভালো করে লক্ষ করতেই বুঝলাম, ওটা আসলে খাঁড়ি নয়, একটা মোহনা। কাল যে নদী পেরিয়ে আমরা দ্বীপের ভেতর ঢুকেছিলাম সম্ভবত সেই নদীটাই ওখানে সাগরে পড়েছে।

ঐ মোহনা বরাবর বেশ স্রোত। সাগরের ভেতর অনেকদূর পর্যন্ত চলে গেছে।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল আমার মাথায়, কোনোমতে যদি ঐ স্রোতের ভেতর নৌকা নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে আর চিন্তা নেই, স্রোতের টানেই জাহাজের একেবারে কাছে পৌঁছে যেতে পারবো।

স্রোতের দিকে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে প্রাণপণে দাঁড় টানতে লাগলাম আমি আর ফ্রিৎস। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সামনে থেকে পেছন পর্যন্ত শিউরে উঠলো নৌকা। পরমুহূর্তে স্রোতের টানে তরতরিয়ে এগোতে লাগলো ওটা খোলা সাগরের দিকে। দাঁড় টানা বন্ধ করে দিলাম আমরা।

বিধ্বস্ত জাহাজটার বেশ কাছ পর্যন্ত নিয়ে গেল আমাদের স্রোত। আবার দাঁড় টানার জন্যে তৈরি হলাম। দাঁড়ের সাহায্যে স্রোতের ভেতর থেকে বের করে আনলাম নৌকাটাকে। কয়েক মিনিট পর ডুবো পাহাড়গুলোর পাশ কাটিয়ে নিরাপদে বিধ্বস্ত জাহাজটার গায়ে নৌকা ভিড়ালাম আমরা। রশি দিয়ে নৌকাটাকে জাহাজের গায়ের সাথে শক্ত করে বেঁধে উঠে পড়লাম জাহাজে।

BanglaBook.org

প্রথমেই প্রাণীগুলো কেমন আছে দেখার জন্যে ছুটে গেলাম। আমাদের দেখেই আনন্দে ডাক ছেড়ে উঠলো ওরা। পানি, খাবার দাবার যা দিয়ে গিয়েছিলাম, এখনো শেষ হয়নি। তারমানে আমাদের অনুপস্থিতিতে খাবারের কষ্ট ভোগ করতে হয়নি ওদের। এবার নৌকা বোঝাই দেয়ার কাজ শুরু করতে হবে। কিন্তু তার আগে খেয়ে নেয়া দরকার। একবার কাজ শুরু করলে কখন খাওয়ার সুযোগ পাবো তার ঠিক নেই, তাছাড়া দুপুরও প্রায় হয়ে এসেছে।

জাহাজের ভাঁড়ার ঘরে প্রচুর খাবার পাওয়া গেল। বিনা বাক্যব্যয়ে খেতে বসে গেলাম। খাওয়া যখন শেষ পর্যায়ে তখন ফ্রিৎস বললো, 'বাবা, আসার সময় স্রোতের টানে চলে এসেছি, যাওয়ার সময় তো ঐ সুবিধাটা পাবো না। আমরা মাত্র দু'জন, বোঝাই নৌকা দাঁড় টেনে নিয়ে যেতে পারবো অতদূর?'

'ঠিক বলেছো!' বললাম আমি। 'খেয়ে উঠেই নৌকায় পাল খাটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আর মালপত্র নেয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে, যেন অতিরিক্ত বোঝাই না হয়ে যায়।'

খাওয়া শেষে দু'জনে ধরাধরি করে লম্বা একটা কাঠের দণ্ড নিয়ে এলাম ডেকে। মাস্তুলের কাজ করবে ওটা। একটা কাঠের বাতা মাস্তুলের সাথে আড়াআড়িভাবে লাগিয়ে ওটার সঙ্গে পাল বাঁধবো। নৌকার নিচে যে তক্তাগুলো আছে সেগুলোর মাঝখানেরটায় চতুর্থ এবং পঞ্চম গামলার মাঝে তুরপুন দিয়ে একটা ফুটো করতে বললাম ফ্রিৎসকে। মাস্তুলের দণ্ডটা যত মোটা ফুটোটাকেও ততখানি চওড়া করতে বলে আমি গেলাম পাল রাখার কুঠুরিতে। নৌকার জন্য যে মাপের পাল দরকার সেই মাপের একটা তিনকোনা কাপড় কেটে নিয়ে তার প্রান্তগুলোয় কয়েকটা করে ছিদ্র করলাম। রশি ঢোকাতে হবে এগুলো দিয়ে। এরপর খুঁজে পেতে একটা ছোট্ট কপিকল যোগাড় করলাম। মাস্তুলের মাথায় বাঁধতে হবে এটা; তাতে পাল ওঠানো-নামানো অনেক সহজ হবে। সব নিয়ে ফ্রিৎস-এর কাছে ফিরে এলাম।

ইতিমধ্যে ফুটোটা করে ফেলতে পেরেছে ও। কাঠের দণ্ডের মাথায় কপিকল লাগিয়ে তিনকোনা পালের সরু দিকটা বেঁধে দিলাম তার সাথে। চওড়া দিকের প্রান্তদুটো বাঁধা হলো আড়াআড়ি কাঠটার দু'প্রান্তের সাথে। তারপর খাড়া করলাম মাস্তুল। মজবুত করার জন্যে ভালো করে বেঁধে দিলাম দড়ি দিয়ে।

'এমন নৌকার নিশ্চয়ই একটা নাম থাকা উচিত, কি বলো, বাবা?' বললো ফ্রিৎস।

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, ঠিক করে ফেল নাম।'

দুজনে আলোচনার পর নৌকার নাম রাখা হলো, *ডেলিভারেন্স*। কারণ, এই নৌকার সাহায্যেই আমরা ডুবে মরার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি।

নৌকায় পাল খাটানোর ব্যবস্থা করতে এত মশগুল ছিলাম, কখন যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি। জিনিসপত্র নৌকায় তুলতেই চলে গেল দিনের বাকি সময়টুকু।

প্রচুর জিনিস নেওয়া হয়েছে। যদিও প্রথমে ভেবেছিলাম একটু কম করে বোঝাই করবো নৌকা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল টাপে-টোপে বোঝাই করার

BanglaBook.org

পরও অতৃপ্তি রয়ে যাচ্ছে মনে। কেবলই মনে হচ্ছে, যে সব জিনিস রেখে যাচ্ছি সেগুলোও তো প্রয়োজনীয়, আর যে সব এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় সেগুলো পরে কোনো না কোনো সময় অত্যন্ত দরকারী বলে মনে হতে পারে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আরেকবার আসবো এখানে।

যেসব জিনিস নিলাম সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ছুরি, কাঁটা, চামচ, আর রান্না-খাওয়ার কাজে লাগে এমন যাবতীয় বাসন-কোসন, হাড়ি, পেয়ালা, কড়াই, কেতলি ইত্যাদি। ছোট এক বাক্স ভর্তি চমৎকার মদও নিলাম। ভাঁড়ার ঘরে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম ওয়েস্টফ্যালিয়া হ্যাম, বলোগনা সসেজ এবং আরো কিছু উপাদেয় খাবার। বিশেষভাবে মনে করে নিলাম ছোট ছোট কয়েকটা থলে ভর্তি ভুট্টা, গম আর অন্যান্য শস্য আর কিছু গোলআলু। এরপর ভারি যন্ত্রপাতি–যেমন: শাবল, খন্তা, দা, কুড়াল, বেলচা, কোদাল ইত্যাদি। আগে যেসব নিয়েছি তাছাড়া আরো যেসব যন্ত্রপাতি ছিলো ছুতোর মিস্ত্রির ঘরে সব নিলাম। ফ্রিৎস স্মরণ করিয়ে দিলো, খালি মাটিতে শুকনো ঘাসের উপর শুতে হচ্ছে আমাদের। সুতরাং কিছু জাহাজী দোলনা আর কম্বল নিতে হলো। আরো যে কটা বন্দুক পিস্তল পেলাম সব নিয়ে তুললাম নৌকায়। সব শেষে নিলাম এক পিপে সালফার, কিছু দড়ি, কিছু সরু সুতা, আর পালের কাপড়ের বেশ বড় সড় একটা গাঁইট।

প্রায় কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেল নৌকা। দুটো মাত্র গামলা খালি, আর ছটাই জিনিস-পত্রে ঠাসা। একবার সন্দেহ হলো, আমরা উঠলে না ডুবে যায় ডেলিভারেন্স। পরীক্ষা করার জন্যে এক এক করে আমি আর ফ্রিৎস উঠলাম গামলা দুটোয়। কিন্তু না, প্রবল স্বস্তির সাথে লক্ষ করলাম, ডুবছে না নৌকা। ফেরার সময় যদি সাগর শান্ত থাকে, আর আমরা বেশি নড়াচড়া না করি, হয়তো নিরাপদেই পৌঁছে যাবো তীরে।

সারাদিন আমরা কাজে এত ব্যস্ত ছিলাম যে বুঝিনি কোথা দিয়ে সময় গেছে। যখন খেয়াল করলাম তখন রাত প্রায় হয় হয়। আজ আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। একটু পরে খালি চোখেই দেখতে পেলাম, তীরে–আমার পরিবারের অন্য সদস্যদের যেখানে থাকার কথা সেখানে, জ্বলে উঠেছে একটা অগ্নিকুণ্ড। বুঝলাম সবকিছু ঠিক ঠাক আছে। আমরাও একটা জাহাজী লণ্ঠন জ্বেলে ঝুলিয়ে দিলাম মাস্তুলের মাথায়। জবাব এলো দুবার বন্দুকের আওয়াজের মাধ্যমে–ওরা দেখেছে আমাদের আলো। দু'পক্ষই এখন নিশ্চিন্ত। ঝটপট রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে নৌকার খালি দুটো গামলায় উঠে পড়লাম আমরা। রাতে এখানেই ঘুমাবো।

দিব্বি কেটে গেল রাতটা। ভালোই ঘুমালো ফ্রিৎস। গামলায় হাত পা ভাঁজ করে বসে বসে ঘুমাতে বিশেষ কষ্ট হলো না ওর। কিন্তু আমি প্রচণ্ড ক্লান্তি সত্ত্বেও একবারের জন্যেও দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। সারারাত তাকিয়ে রইলাম তীরের দিকে, আমার ছোটো তিন ছেলে আর তাদের মা ওখানে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। বার বার গতরাতের সেই শেয়ালের হামলার কথা মনে পড়তে লাগলো। এক মাত্র ভরসা কুকুর দুটো। কিন্তু কালকের মতো ডজন খানেক যদি এক সঙ্গে আসে তাহলে কতক্ষণ যুঝতে পারবে টার্ক আর পনটো?

BanglaBook.org

ছয়

পরদিন দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই আমরা উঠে এলাম ডেকে। জ্যাকের দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে তাকালাম তীরের দিকে। ফ্রিৎস বসলো হ্যাম আর বিস্কুট দিয়ে নাশতা সাজাতে।

দূরবীনটা খুব শক্তিশালী নয়, ভালো দেখতে পেলাম না খাঁড়ির তীরে আমাদের তাঁবুটা। আমার মনে পড়লো, ক্যাপ্টেনের কেবিনে একটা বড়, শক্তিশালী দূরবীন আছে। ক্যাপ্টেনের কেবিনে গিয়ে নিয়ে এলাম দূরবীনটা। ততক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে চারদিক। পুব আকাশ লাল করে সূর্য উঠছে।

বড় দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে দেখলাম তাঁবুর সামনেটা ফাঁকা। একটু পরেই এলিজাবেথ বেরিয়ে এলো। মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। একটু পরে আর্নেস্ট, জ্যাক আর ফ্রান্সিস-ও বেরিয়ে এলো তাঁবুর বাইরে। বিরাট একটা ভার নেমে গেল আমার বুক থেকে। ঠিকই আছে ওরা। দূরবীনটা ফ্রিৎসকে দিলাম। মা এবং ভাইদের স্বচক্ষে দেখে ও-ও বেশ স্বস্তি পেলো।

তাড়াতাড়ি নাশতা সেরে নিলাম আমরা। এবার প্রাণীগুলোকে তীরে নেয়ার উপায় বের করতে হবে।

ফ্রিৎস বললো, 'ওদের জন্য ভেলা জাতীয় কিছু একটা তৈরি করে নিলে হয় না?'

'তা করা যায়,' বললাম আমি, 'কিন্তু ভেবে দেখ, কত সময় লাগবে ভেলা বানাতে, পরিশ্রমটাও কেমন হবে? তার মানে আজও আমাদের এখানে থাকতে হবে।'

'তাহলে?...'

'আমিও তাই ভাবছি। তাহলে?...'

চুপ-চাপ ভাবছি আমি আর ফ্রিৎস! কোনো বুদ্ধি আসছে না মাথায়।

'পেয়েছি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো ফ্রিৎস। 'সাঁতার কাটিয়ে নেবো ওগুলোকে। লম্বা একটা রশি দিয়ে সবকটাকে বেঁধে রশির এক প্রান্ত বেঁধে দেবো নৌকার সঙ্গে। নৌকার পিছন পিছন সাঁতরে যাবে ওরা।'

বুদ্ধিটা মন্দ বের করেনি ফ্রিৎস। তবু একটু দ্বিধা আমার মনে। এখান থেকে তীরের দূরত্ব কম নয়। এতখানি পথ একটানা সাঁতরে যেতে পারবে তো প্রাণীগুলো? ফ্রিৎসই সমাধান দিলো।

'পানিতে নামানোর আগে প্রত্যেকটার গায়ে একটা করে খালি পিপে বেঁধে দেবো,' বললো ও। 'আমার ধারণা, তাহলে অনায়াসে সাঁতরে যেতে পারবে ওরা।'

'ভালো বুদ্ধি। তাহলে চলো, আগে একটা ভেড়াকে ওভাবে পানিতে নামিয়ে দেখি।'

BanglaBook.org

পাঁচ মিনিটের মাথায় একটা ভেড়াকে পিপে বেঁধে পানিতে নামিয়ে দিলাম। প্রথমে তো কিছুতেই নামবে না ওটা। অবশেষে অনেক ঠেলেঠুলে নামানো হলো। নামানোর সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল ভেড়াটা। দমে গেল আমার মন। না, এ বুদ্ধিটা বোধ হয় চলবে না! মাঝখান থেকে একটা ভেড়া হারালাম।

কিন্তু না, দু'তিন সেকেণ্ড পর আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, পানির ওপর ভেসে উঠেছে ভেড়াটার মাথা ও পিঠ। দড়ি ধরে এপাশে ওপাশে টেনে দেখলাম, ভালোই সাঁতরাতে পারছে। একটু পরেই হয়রান হয়ে পড়লো ওটা। চার পা ঝুলিয়ে দিয়ে চুপ-চাপ ভেসে রইলো শুধু। এতেই চলবে। ওরা কোনো মতে ভেসে থাকতে পারলেই হয়।

'আর চিন্তা নেই, ফ্রিৎস!' চিৎকার করলাম আমি। 'এই জন্তুগুলো সব আমাদের! সব আমরা নিয়ে যাবে ডাঙায়!'

এর পর আমরা ঝটপট অন্য জন্তুগুলোর পিঠেও একই ভাবে খালি পিপে বেঁধে দিলাম। লম্বা রশি দিয়ে বেঁধে ফেললাম একটার পর একটা। তারপর একটা একটা করে ঠেলে নামিয়ে দিলাম পানিতে। গরু আর গাধা দুটোর পিঠের দু'পাশে একটা করে ছোট পিপেও বেঁধে দিলাম। মাদী শূকরটার পিঠেই কেবল নিরাপত্তামূলক কিছু বাঁধতে পারলাম না আমরা। চার পা ছুঁড়ে এমন বিকট চিৎকার জুড়ে দিলো যে শুধু গলায় দড়ি বেঁধেই ওটাকে পানিতে নামাতে হলো।

এবার যাত্রা শুরু। আমি আর ফ্রিৎস উঠে পড়লাম ডেলিভারেন্স-এ। প্রথমে কিছুক্ষণ দাঁড় টেনে জাহাজের কাছ থেকে সরিয়ে আনলাম নৌকাটাকে। তারপর পাল তুলে দিলাম। তরতর করে এগিয়ে চললো নৌকা ডাঙার দিকে। পালটা খুব ভাল কাজ করছে। ওটা ছাড়া, আমার মনে হয়, কিছুতেই আমরা তীরে পৌঁছুতে পারতাম না। জাহাজের কাছ থেকে যখন নৌকাটাকে দূরে সরাই তখনই টের পেয়েছি, এরকম বোঝাই নৌকা মাত্র দু'জনে দাঁড় টেনে নিয়ে যাওয়া কী অসম্ভব একটা ব্যাপার।

প্রায় অর্ধেক পথ পার হয়ে এসেছি। হঠাৎ ফ্রিৎস চেঁচিয়ে উঠলো:

'বাবা, দেখ, কি বিরাট একটা মাছ এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে!'

ফ্রিৎস-এর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাতেই দেখতে পেলাম! নৌকার কাছে এসে গেছে!

'বন্দুক নিয়ে তৈরি হও, ফ্রিৎস,' ব্যস্ত গলায় বললাম আমি। 'ওটা মাছ নয়, হাঙর! আর একটু কাছে এগিয়ে এলেই এক সাথে গুলি করবো দু'জন।'

বন্দুক হাতে তৈরি হলাম আমি আর ফ্রিৎস। ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে এগিয়ে আসছে হাঙরটা। পিঠের ওপর তার তিনকোনা পাখনা জল কাটছে তরতর করে। নৌকা থেকে বেশি দূরে নেই। আর কয়েক ফুট এলেই প্রথম ভেড়াটার ওপর ছোঁ মারতে পারবে। গর্জে উঠলো ফ্রিৎস-এর বন্দুক। হাঙরের মাথায় লাগলো গুলি। ভয়ঙ্কর একটা লাফ দিয়ে চিৎ হয়ে গেল ওটা। মসৃণ সাদা পেটটা দেখলাম চকিতের জন্যে। তারপর লাল একটা রেখা ছাড়তে ছাড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল গভীর সাগরে। আমি গুলি করার সুযোগই পেলাম না।

বাকি পথটুকু নিরাপদে পেরিয়ে অবশেষে তীরে পৌঁছুলাম। দড়ি খুলে দিতেই

BanglaBook.org

লাফ দিয়ে দিয়ে ডাঙায় উঠে পড়লো জন্তুগুলো। পাল নামালো ফ্রিৎস। তারপর আমরাও নামলাম। নৌকাটাকে ঠিক মতো বেঁধে জন্তুগুলোর গা থেকে পিপে খুলে নিলাম। কিন্তু আশ্চর্য! আর্নেস্ট, জ্যাক, ফ্রান্সিস বা এলিজাবেথ কারো দেখা নেই। এতক্ষণ ভাবছিলাম, তীরে পৌঁছুনোর সাথে সাথে হৈ-চৈ করে অভ্যর্থনা জানাবে ওরা। কিন্তু নৌকা তীরে ভেড়ানোর পর বেশ কয়েক মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পরও ওদের কোনো সাড়া শব্দ নেই। ব্যাপারটা কি?

তাড়াতাড়ি এগিয়ে তাঁবুর ভেতর উঁকি দিলাম। বুকটা ধক করে উঠলো। শূন্য তাঁবু! টার্ক আর পনটোরও কোনো পাত্তা নেই! কোনো বিপদ হলো, না কি নিজেরাই কোথাও গেল?

এমন সময় উৎফুল্ল কণ্ঠের চিৎকার শুনে দেহে প্রাণ ফিরে পেলাম যেন আমি। মুখ তুলতেই দেখি, ফ্রান্সিস, জ্যাক আর আর্নেস্ট ছুটতে ছুটতে আসছে আমাদের দিকে। একটু পেছনেই এলিজাবেথ। চার জনেরই মুখে উদ্ভাসিত হাসি।

'ওহ্, তোমরা এসেছো!' বলে উঠলো এলিজাবেথ। 'কিছুতেই আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, অবলা জীবগুলোকে কি করে আনবে। ওগুলোর গা ভেজা দেখছি। সাঁতার কাটিয়ে এনেছো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমরা গিয়েছিলে কোথায়?'

'একটু ঘুরে ফিরে দেখে এলাম চারপাশটা।'

'হা! হা!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো পিচ্চি ফ্রান্সিস, 'ওটা আবার কি লাগিয়েছো তোমাদের নৌকায়? দেখ, মা, পাল! আরে, মাস্তুলের মাথায় দেখি নতুন একটা পতাকা! কি সুন্দর!'

আর্নেস্ট আর জ্যাকও খেয়াল করেছে ব্যাপারটা। নৌকার কাছে গিয়ে অবাক চোখে দেখছে আর সমানে প্রশ্ন করে চলেছে ফ্রিৎসকে।

নৌকা থেকে মালপত্র নামানোর জন্যে এগোলাম আমি। এমন সময় খেয়াল করলাম জ্যাকের কোমরে হলুদ একটা চামড়ার বেল্ট। তার সাথে ঝুলছে এক জোড়া পিস্তল।

'আরে, জ্যাক!' অবাক গলায় বললাম আমি, 'ও জিনিস কোথায় পেলে? একদম বোম্বেটের মতো দেখাচ্ছে!'

'নিজে বানিয়েছি,' গর্বের সাথে বললো জ্যাক। 'টার্ক আর পনটোর দিকে তাকাও, আরো দেখতে পাবে এমন জিনিস।'

সত্যিই তাই, কুকুর দুটোর গলায়ও একই রকম হলুদ চামড়ার বেল্ট।

'কিন্তু, তুমি চামড়া পেলে কোথায়? আর সুতো, সুঁই?'

'ফ্রিৎস-এর শেয়ালের চামড়া,' জবাব দিলো এলিজাবেথ, 'আর সুঁইসুতো একজন ভালো গৃহিণীর কাছে সব সময়ই থাকে। আমার একটা ঝোলা আছে দেখনি? সুঁইসুতো ছাড়াও টুকটাক আরো অনেক দরকারী জিনিস আছে ওতে।'

প্রশংসার দৃষ্টিতে আমি তাকালাম জ্যাক আর ওর মা-র দিকে। কিন্তু ফ্রিৎস-এর চোখে রাগের ভাব। নিজ হাতে মারা শেয়ালের চামড়ার এমন 'অপব্যবহার' কিছুতেই যেন সইতে পারছে না ও। এদিকে বলতেও পারছে না কিছু, যত যা-ই হোক, জ্যাক কাজটা খারাপ করেনি। জ্যাকের দিকে দু'পা এগিয়েই নিজের নাক

BanglaBook.org

চেপে ধরলো ফ্রিৎস।

'উহ্, কি জঘন্য দুর্গন্ধ! নিশ্চয়ই তোমার কাছ থেকে আসছে, জনাব চর্মকার!'

'উঁহুঁ, তোমার কাছ থেকে,' প্রতিবাদ করলো জ্যাক। 'তোমার শেয়ালের চামড়া রোদে শুকিয়ে গন্ধ ছড়াচ্ছে মানে তুমিই গন্ধ ছড়াচ্ছো।'

'আমার শেয়ালের চামড়া যদি এতই খারাপ, তা নেয়ার কি দরকার ছিলো?'

'আহ্ হা, ফ্রিৎস, এটা কি হচ্ছে?' বললাম আমি। 'চামড়াটা তো ও নষ্ট করেনি, কাজে লাগিয়েছে। শোনো, ছেলেরা, জন মানুষহীন একটা দ্বীপে এসে পড়েছি আমরা, আমাদের কোন আশ্রয় নেই, সম্বল বলতে জাহাজ থেকে যা নিয়ে এলাম এ-ই। ভেবে দেখ, সামনে কি কষ্ট করতে হবে আমাদের! এর ভেতর আবার যদি নিজেরা ঝগড়া শুরু করো তাহলে কি করে চলবে? এই মুহূর্ত থেকে *তোমার* বা *আমার* বলে কোনো শব্দ থাকবে না আমাদের এই সুখী পরিবারে। শুধু থাকবে *আমাদের*। আমরা যে যা-ই করি না কেন, করবো আমাদের সবার জন্যে; বুঝেছো? জ্যাক, তোমার বেল্টের চামড়া এখনো ভালো করে শুকায়নি। তুমি হয়তো তৈরি করতে পারার আনন্দে পরে আছো, কিন্তু দুর্গন্ধ ওটা ঠিকই ছড়াচ্ছে। এখন ওটা খুলে তাড়াতাড়ি শুকাতে দাও। তারপর এসে ভাইদের সাথে হাত লাগাও, শেয়ালটাকে সাগরে ফেলে দাও। এরপর আরো কাজ আছে, নৌকা থেকে মালপত্র নামাতে হবে।'

চার ভাই চলে গেল শেয়ালের মৃতদেহটা সাগরে ফেলে দিতে। নৌকা থেকে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করলাম আমি। একটু পরেই ছেলেরা এসে যোগ দিল আমার সাথে। ধীরে ধীরে পুরো নৌকা খালি করে ফেললাম আমরা। তাঁবুর সামনে স্তূপ করে রাখা হলো সব জিনিস।

ইতিমধ্যে বিকেল হয়ে গেছে। কিন্তু রান্নার কোনো আয়োজন হচ্ছে না দেখে একটু আশ্চর্য হলাম আমি। ফ্রিৎসকে ডেকে ওয়েস্টফ্যালিয়া হ্যামের বাক্সটা নিয়ে আসতে বললাম। রীতিমত আশ্চর্য হয়ে দেখলো এলিজাবেথ বাক্সটা।

'হ্যাম!' আমি আর ফ্রিৎস ছাড়া আর সবাই চিৎকার করে উঠলো এক সাথে। 'ওহ্, আজ সন্ধ্যায় খাওয়াটা যা হবে না!'

'যদি আমরা এটা না নিয়ে আসতাম তাহলে কি হতো?' বললাম আমি। 'না খেয়েই আজ রাতে শুতে হতো হয়তো!'

'মোটেই না,' প্রতিবাদ করলো আমার স্ত্রী। 'তুমি বুঝি ভেবেছো খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা আমি করিনি? তোমার এই হ্যাম এসে যাওয়াতে খাওয়াটা একটু ভালো হবে সন্দেহ নেই, তবে আমিও সামান্য কিছু ব্যবস্থা করেছি।' প্রায় এক ডজন কচ্ছপের ডিম দেখালো ও।

'দেখ, বাবা!' বলে উঠলো আর্নেস্ট, 'রবিনসন ক্রুসো তার দ্বীপে যেগুলো পেয়েছিলো ঠিক তেমন না ডিমগুলো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কোথায় পেলে ওগুলো? কি করে?'

'সে এক ইতিহাস,' জবাব দিলো এলিজাবেথ। 'পরে বলবো।'

'ঠিক আছে, ওমলেট তৈরি করে ফেল, খেতে খেতে শুনবো।'

সাত

একটু পরেই খাবার দেয়া হলো। দুটো বাক্স পাশাপাশি রেখে তার ওপর একটা কাপড় বিছিয়ে টেবিল বানানো হয়েছে। জাহাজ থেকে আনা ঝকঝকে ছুরি, কাঁটাগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে তার ওপর। চীনা মাটির বাটিতে পরিবেশিত হয়েছে, হ্যাম, ওমলেট, বিস্কুট।

'এবার বলো তোমার ইতিহাস,' খেতে শুরু করে বললাম আমি।

'হ্যাঁ, বলছি,' শুরু করলো এলিজাবেথ, 'তোমরা যাওয়ার পর প্রথম দিন, মানে কাল কিছুই করিনি আমরা। তোমাদের জন্যে দুশ্চিন্তা করতে করতেই চলে গেছে দিনটা। গতরাতে তোমরা নিরাপদে আছো সংকেত পাওয়ার পর ঠিক করলাম বসে না থেকে আজ একটু ঘুরে ফিরে দেখবো চারপাশটা। তোমরা দুজন তো দিব্বি বেড়িয়ে এলে সেদিন, আমরাই বা বসে থাকি কেন? তাছাড়া এ জায়গায় থাকতে একদম অসহ্য লাগছে আমার, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বালি পাথর এমন গরম হয়ে ওঠে, রীতিমতো হাঁপিয়ে পড়ি। ভাবলাম এরচেয়ে ভালো কোনো জায়গার খোঁজ পাওয়া যায় কিনা দেখি।'

'বেশ বেশ, তারপর?'

'মনে মনে বুদ্ধিটা ঠিক করে ছেলেদের জাগিয়ে দিয়ে নাশতা তৈরি করতে বসলাম। নাশতা তৈরি করে যখন খেতে ডাকলাম, দেখি আর্নেস্ট আর ফ্রান্সিস এসেছে, জ্যাকের খোঁজ নেই। উঠে গেলাম ওকে খুঁজতে। খুব একটা খুঁজতে হলো না, তাঁবুর ওপাশেই পেয়ে গেলাম ছোঁড়াকে। মরা শেয়ালটার গা থেকে চামড়া ছাড়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, কি করবি চামড়া দিয়ে? বললো, বেল্ট বানাবে। আমি বললাম: ঠিক আছে, বানাস বেল্ট, আগে আয় খেয়ে যা। একটা কাঠের সাথে চামড়াটা টান করে পেরেক দিয়ে আটকে দিলো জ্যাক। ওটা রোদে শুকাতে দিয়ে খেতে এলো ও।

'খাওয়া শেষ করে আমার পরিকল্পনার কথা জানালাম। শুনে খুশিতে লাফিয়ে উঠলো ওরা। কয়েক মিনিটের ভেতর আমরা তৈরি হয়ে গেলাম। প্রত্যেকে একটা করে ঝোলা নিলাম কাঁধে। তার ভেতর রইলো ছুরি, চাকু, খাবার দাবার। আমি নিলাম একটা বড় পানির বোতল। আর্নেস্টের বন্দুকটা ধার নিলাম আমি, আর ওকে দিলাম একটা ছোট বন্দুক। এছাড়া একটা ছোট কুঠারও নিলাম।

'রওনা হলাম আমরা। তোমাদের সঙ্গে গিয়েছিলো টার্ক, পথ ঘাট মোটামুটি চেনে। ও আগে আগে চললো পথ প্রদর্শক হিশেবে। কিছুক্ষণের ভেতর আমরা পৌঁছে গেলাম তোমরা যেখান দিয়ে নদী পার হয়েছিলে সে জায়গায়। পানির বোতলটা ভরে নিলাম ওখান থেকে।

'আর্নেস্ট প্রথম ওপারে গিয়ে পৌঁছুলো। একটু পরে আমরা বাকি ক'জন-ও নিরাপদে নদী পার হলাম। ফ্রান্সিস মিয়াকে আমি কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম।

'নদীর ওপারে পৌঁছেই পাহাড়ের ওপাশে বিস্তৃত সমভূমির দিকে চোখ পড়লো আমার। একদিকে ছোট্ট একটা বন। আসলে বনটা খুব ছোট নয়, অনেক দূর থেকে দেখেছিলাম তো, তাই ছোট দেখাচ্ছিলো। ঐ বনের কাছে যাবো ঠিক করলাম। কিন্তু বাদ সাধলো শক্ত এক ধরনের ঘাস। আমার বুক সমান উঁচু, ছেলেদের তো মাথা পর্যন্ত ডুবে যায় সে ঘাসে। নিশ্চয়ই তোমরাও ঝামেলায় পড়েছিলে ওই ঘাস নিয়ে?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'তারপর?'

'নদীর পাড় ধরে এগোতে লাগলাম আমরা। ঠিক করলাম, যে মুহূর্তে দেখবো বন থেকে দূরে সরে যাচ্ছি তক্ষুণি মোড় নিয়ে এগোবো বনের দিকে; প্রয়োজন হলে ঘাসের বনে ঢুকবো। দু'এক জায়গায় তোমাদের পায়ের ছাপ নজরে পড়লো। সাবধানে সেই ছাপ অনুসরণ করে এগোতে লাগলাম আমরা। কিছুক্ষণ পর আর চলা গেল না। নদীর পাড়ও ছেয়ে আছে ঐ মানুষ সমান উঁচু ঘাসে। এবার বাধ্য হয়েই সরাসরি বনের দিকে এগোতে হলো আমাদের।

'কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বেশ জোর একটা আওয়াজ শুনে ঘাবড়ে গেলাম আমি। আমাদের কিছুটা সামনে থেকে আসছিলো শব্দটা। ক্রমশ ওপর দিকে উঠে যাচ্ছিলো। বন্দুক বাগিয়ে তৈরি হলো আর্নেস্ট। কয়েক সেকেণ্ড পর দেখলাম বিরাট একটা পাখি ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উঠে পড়েছে আকাশে। ততক্ষণে জ্যাকও বন্দুক তাক করেছে। কিন্তু দু'জনের একজন-ও গুলি করতে পারলো না। তার আগেই চোখের আড়ালে চলে গেল পাখিটা।

'আবার এগোলাম আমরা—পাখিটা যেখান থেকে উড়েছিলো সেদিকে। ছেলেরা দেখতে চায় ওখানে কোনো বাসা আছে কিনা। কয়েক পা এগোতেই আরেকটা পাখি—আগেরটার মতোই বিরাট—ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উঠে পড়লো আকাশে। হতভম্বের মতো চেয়ে রইলো আর্নেস্ট, জ্যাক আর ফ্রান্সিস। হাসি এসে গেল আমার ওদের ভঙ্গি দেখে। বললাম: "চলো দেখি কি আছে ওখানে।"

পাখি দুটো যেখান থেকে উড়েছে, জায়গাটা পরীক্ষা করলাম। বিরাট একটা পাখির বাসা সেখানে। শুকনো ঘাস, ডাল, লতা-পাতার তৈরি। কয়েক টুকরো ভাঙা ডিমের খোলা শুধু পড়ে আছে তাতে, আর কিছু নেই। মানে, বেশ আগেই ডিম ফুটে বেরিয়েছে বাচ্চা। কিন্তু কোথায় সেগুলো বুঝতে পারলাম না। আর বাচ্চাগুলো যদি বড় হয়ে উড়ে গিয়ে থাকে তাহলে ওদের বাপ মা বাসায় কি করছিলো?—এ প্রশ্নেরও কোনো সমাধান পেলাম না।

'যাহোক, আবার এগোতে শুরু করলাম আমরা। কিছুক্ষণের ভেতর পৌঁছে গেলাম বনের কাছে। নানা ধরনের পাখি দেখতে পেলাম সেখানে। একবার উড়ছে, একবার বসছে গাছের ডালে। আমাদের দেখে মোটেই ভয় পেলো না পাখিগুলো। যে গাছগুলোয় ওরা বসে ছিলো সেগুলো যদি দেখতে! জীবনে আমি অত বড় গাছ দেখিনি। দূর থেকে মনে হয়েছিলো রীতিমতো বন, কিন্তু আসলে সেখানে মাত্র চোদ্দটা গাছ। এই চোদ্দটা গাছই বিরাট একখণ্ড জমি দখল করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মোটা মোটা ডালগুলো থেকে ঝুরি নেমেছে। ঝুরিগুলোও কি মোটা বাবা! জ্যাক একটার বেড় মেপে দেখেছে, সাড়ে বাইশ ইঞ্চি। আমি

একটা গাছের গোড়ায় চক্কর দিয়ে দেখেছি, বত্রিশ কদম। তাহলে বোঝো কি বিশাল গাছ! পাতাগুলো বড় বড়, ঘন হয়ে জন্মেছে। হ্যাজেল গাছের সঙ্গে বেশ মিল গাছগুলোর, কিন্তু আসলে হ্যাজেল না।'

'মোটা একটা শিকড়ের ওপর কিছুক্ষণ বসে রইলাম আমরা। জ্যাক আবার তার বেল্ট বানাতে বসলো। ও, বলতে মনে ছিলো না, যে কাঠটার ওপর চামড়া শুকাতে দিয়েছিলো সেটা সাথে করে নিয়ে এসেছিলো ও। ততক্ষণে মোটামুটি শুকিয়েছে চামড়া। সুঁই সুতো দিয়ে আমিও সাহায্য করলাম ওকে। বেল্ট তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই ও পরে নিলো সেটা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে লাগলো আমাদের। কুকুর দুটোর গলায়ও পরিয়ে দিলো দুটো বেল্ট। এরপর আমরা বাড়ির পথ ধরলাম।

'আসার পথে সাগর পাড়ে একটা চক্কর দিয়ে এলাম। অনেক কাঠের টুকরো, বড়-ছোট নানা আকারের বাক্স, পিপে দেখলাম। দু-একটা টানা হ্যাঁচড়াও করলাম আনার জন্যে, কিন্তু আমাদের শক্তিতে কুলালো না। শেষে আর কি? হতাশ মনে ফিরতি পথ ধরলাম। হঠাৎ খেয়াল করলাম সৈকতের ওপর এক জায়গায় পা দিয়ে বালি খোঁচাচ্ছে পনটো। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। সাদা, গোল গোল কি যেন বালির নিচ থেকে বের করছে আর টপাটপ গিলে ফেলছে ও। ভালো করে খেয়াল করতেই বুঝলাম জিনিসগুলো কি। কচ্ছপের ডিম। পনটোকে ওখান থেকে সরিয়ে দিয়ে ডিমগুলো বের করে ঝোলায় ভরে নিলাম। আমার ধারণা যতগুলো আমরা পেয়েছি কমপক্ষে আরো ততগুলো খেয়ে ফেলেছিলো পনটো।

'আবার রওনা হবো, এমন সময় হঠাৎ চোখ গেল সাগরের দিকে। দূরে পাল তোলা একটা নৌকার মতো দেখে চমকে উঠলাম। মনে হলো ডাঙার দিকেই আসছে জিনিসটা। ভীষণ ঘাবড়ে গেছিলাম আমি। ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করবো। *সবজান্তা* আর্নেস্ট আমাকে আশ্বস্ত করলো। বললো, তুমি আর ফ্রিৎস জিনিসপত্র নিয়ে ফিরছো। পিচ্চি ফ্রান্সিসও ভীষণ ভয় পেয়েছিলো। ও ভেবেছিলো, রবিনসন ক্রুসোর দ্বীপে যেমন হয়েছিলো তেমন বোধ হয় জংলীরা খেতে আসছে আমাদের। অবশ্য একটু পরেই বুঝতে পারলাম, আর্নেস্টের কথাই ঠিক। তখন তোমার ছেলেদের খুশি দেখে কে! পারলে আমাকে ফেলেই ছুটে চলে যায়।

'যতটা সম্ভব জোরে হাঁটলাম আমরা। নদী পার হয়ে যখন পৌঁছুলাম দেখি, তোমরা নৌকা থেকে নামছো।'

মনে মনে আমি এলিজাবেথের সাহসের প্রশংসা না করে পারলাম না। বাচ্চা বাচ্চা তিন ছেলেকে সাথে নিয়ে ওরকম অজানা বনে যাওয়ার সাহস দেখানো যে সে লোকের কাজ নয়!

আট

পরদিন ভোরে আবার কথাটা তুললো এলিজাবেথ: 'এ জায়গায় বাস করা অসম্ভব। ভীষণ গরম। আশেপাশে দু-একটা গাছও যদি থাকতো, একটু ছায়া পেতাম। কাল যে বন দেখে এসেছি, চল ওখানে চলে যাই আমরা। গাছের ওপর একটা ঘর বানিয়ে নেবো। গাছগুলো যা বড় বড় দিব্বি ঘর বানানো যাবে কোনো একটার ডালে।'

'গাছের ওপর ঘর! উঠতে নামতে হলে মই লাগবে তো,' বললাম আমি। 'তাছাড়া আমাদের এত জিনিসপত্র ওখানে নিয়ে যাবো কি করে? নদী পার করাটাই হলো বড় সমস্যা। একটা পুল না বানালে কিছুতেই এত জিনিস নিয়ে নদী পার হওয়া যাবে না। এ জায়গাটা খারাপ কেন মনে হচ্ছে তোমার? বড় বড় পাথরের আড়ালে ভালোই তো আছি। আরো কয়েকটা দিন এখানে থাকতে হবে। তাছাড়া ভাঙা জাহাজটা এত কাছে, আরো কিছু জিনিসপত্র এনে নিতে চাই আগে।'

'জায়গাটা খারাপ কেন মনে হচ্ছে? একদিন দুপুর বেলায় থাকো এখানে, তখন বুঝবে। সূর্য যত উপরে উঠতে থাকে পাথরও তত গরম হতে থাকে। তাছাড়া ফলমূল খুঁজতে হলে কমপক্ষে দু'মাইল হাঁটতে হবে। বনে কত ফল আছে তা জানো? আরো একটা ব্যাপার, এ জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়। সেদিন রাতে শেয়ালের হামলার কথা মনে আছে? এরপরে হয়তো বাঘ আসবে। আর, তোমার ঐ ভাঙা জাহাজে গিয়ে আরো জিনিস নিয়ে আসার বুদ্ধিটাও একদম পছন্দ নয় আমার। ঐ ভয়ঙ্কর সাগরের ওপর দিয়ে তোমরা যখন যাও, রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে উঠি আমি।'

'বেশ বেশ, তুমি যখন চাইছো, গাছে গিয়েই ঘর বাঁধবো আমরা। তবে তার আগে এখানে একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে যেখানে আমরা খাবার দাবার আর অন্যান্য জিনিস নিরাপদে রেখে যেতে পারবো। বিপদ-আপদ কিছু হলে আবার যেন চলে আসতে পারি এখানে। তারপর তৈরি করতে হবে পুল।'

'পুল কেন তৈরি করতেই হবে, আমি বুঝতে পারছি না।' একটু অসহিষ্ণু শোনালো আমার স্ত্রীর গলা। 'গরু আর গাধার পিঠে চাপিয়েই তো সব জিনিস নিয়ে যেতে পারি আমরা, দরকার হলে কয়েক বারে নেবো। আর নদী আগে যেমন করে পেরিয়েছি তেমন করেই পেরোবো।'

'আমরা যেমন পাথর টপকে টপকে নদী পেরিয়েছি গরু বা গাধা তেমন পারবে না। ওদের যেতে হবে পানির ভেতর দিয়েই। সেক্ষেত্রে পিঠে জিনিসপত্র থাকলে সব ভিজবে। বারুদ বা খাবার-দাবার পানিতে ভিজলে কি অবস্থা হবে? তাছাড়া পুল বানালে নদী পার হওয়ার জন্যে অতটা ঘুরতেও হবে না।'

'বেশ, হোক তাহলে পুল। কিন্তু দেরি করা মোটেও চলবে না। আগে এখান

BanglaBook.org

থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা, তারপর অন্য কাজ। আর হ্যাঁ, আমার মনে হয় বারুদের বেশির ভাগ এখানে রেখে যাওয়া-ই ঠিক হবে। তা না হলে বজ্রপাত বা ছেলেদের কারো বোকামির কারণে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।'

'কথাটা খারাপ বলোনি।' বলে আমি ঘুম থেকে ডেকে তুললাম ছেলেদের। সম্ভব হলে আজই আমরা একটা পুল তৈরি করতে যাচ্ছি শুনে খুব খুশি হলো ওরা। সেই সাথে এই আশঙ্কাও প্রকাশ করলো যে, অনেক সময় লাগবে পুলটা তৈরি করতে। চার পাঁচ দিন লেগে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

'দেখা যাক ক'দিন লাগে,' বললাম আমি।

ঝটপট নাশতা সেরে নিয়ে আরেকবার ভাঙা জাহাজে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলাম আমরা। পুলের জন্যে কিছু কাঠ খুলে আনতে হবে জাহাজ থেকে। এবার আর্নেস্টকে-ও নেবো, ঠিক করেছি। কাজের লোক বেশি থাকলে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবো।

বাতাস বইছে সমুদ্রের দিক থেকে। ফলে যাওয়ার পথে পাল ব্যবহার করতে পারছি না আমরা। দাঁড় টেনে এগোলাম সেই স্রোতটার দিকে। স্রোতের মুখে পড়তেই তর তর করে এগোলো নৌকা। শিগগিরই বার সমুদ্রে চলে এলাম আমরা। খুব ছোট্ট একটা দ্বীপ–আসলে একটা ডুবো পাহাড়–চোখে পড়লো। দ্বীপটাকে একপাশে রেখে এগিয়ে চললো নৌকা। দূরে ছিলো বলে খেয়াল করিনি, এখন দেখলাম, অসংখ্য সী-গাল উড়ছে দ্বীপটার ওপর। তাদের চিৎকারে কান পাতা দায়। ব্যাপার কি? ওখানে এত সী-গাল কেন? কৌতূহলী হয়ে আমি নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিলাম দ্বীপটার দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে দেখলাম ডাঙার ওপরও অসংখ্য পাখি। কিছু একটার ওপর হামলে পড়েছে তারা।

কূলে গিয়ে ঠেকলো নৌকা। আমাদের সাড়া পেয়েই খ্যাঁক খ্যাঁক করতে করতে আকাশে উঠে পড়লো বেশির ভাগ সী-গাল। কিসের ওপর ওরা হামলে পড়েছিলো এবার দেখতে পেলাম। বিরাট একটা মাছের মতো কি যেন পড়ে আছে কূলে। সেটাই মনের সুখে খাচ্ছিলো।

ডাঙায় নেমে একটু এগোতেই বুঝলাম মাছটা আর কিছু নয়, কাল যে হাঙরটাকে গুলি করেছিলো ফ্রিৎস সেটা। কৌতূহল মিটেছে, এবার আবার রওনা হতে হবে। হঠাৎ খেয়াল করলাম, ছোট্ট দ্বীপটার পাথুরে সৈকতে পড়ে আছে অনেক কাঠ। বড়, ছোট নানা আকারের। সম্ভবত জোয়ারের সময় ভেসে এসেছে ভাঙা জাহাজটা থেকে।

'নিতে হবে কাঠগুলো,' বললাম আমি।

তিন বাপ ব্যাটায় ধরাধরি করে নিয়ে এলাম ওগুলো নৌকার কাছে। লম্বা কাঠগুলোকে পাশাপাশি রেখে ভেলার মতো করে বেঁধে ফেললাম। তার ওপর রাখলাম ছোট কাঠগুলো। এরপর ঠেলাঠেলি করে ভেলাটা ভাসিয়ে দিলাম পানিতে। নৌকার পেছনে বেঁধে দিলাম শক্ত দড়ি দিয়ে। তারপর আবার ভেসে পড়লাম সাগরে। জাহাজে যাওয়ার আর দরকার নেই। যা কাঠ পেয়েছি এ দিয়েই পুল তৈরি হয়ে যাবে, কিছু কাঠ বেঁচেও যাবে হয়তো। সুতরাং বাড়ি ফিরে যেতে পারি আমরা।

BanglaBook.org

দ্বীপ থেকে একটু দূরে সরে এসেই পাল তুলে দিলাম। হাল ধরে বসে আছি আমি। দাঁড় টানার দরকার নেই। হাঙরের মুখ মাথার নিচের দিকে কেন তা নিয়ে তর্ক করছে ফ্রিৎস আর আর্নেস্ট।

রওনা হওয়ার চার ঘণ্টার ভেতর ফিরে এলাম আমরা আমাদের খাঁড়িতে। ঈশ্বরের কৃপা থাকলে এমনই হয়, সারাদিনের কাজ আমরা সেরে এলাম মাত্র চার ঘণ্টায়। সাতটায় রওনা দিয়েছিলাম এখন বাজে মাত্র এগারোটা।

যাওয়ার আগে ভেবেছিলাম কাল থেকে শুরু করবো পুল তৈরির কাজ। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারায় এখন মনে হচ্ছে, দিনের বাকি সময়টুকু নষ্ট করবো কেন? তাড়াতাড়ি হালকা কিছু খেয়ে নিয়ে লেগে গেলাম কাজে।

কাঠগুলো সাগর তীর থেকে নদীর তীরে বয়ে নেয়ার জন্যে ব্যবহার করলাম গরু আর গাধাটাকে। মাত্র দু-তিন বারেই ওরা সব কাঠ টেনে নিয়ে গেল নদীর তীরে। ইতিমধ্যে জ্যাক বাছাই করে ফেলেছে পুল তৈরির স্থান। ওর মতে নদীর ঐ জায়গাটাই চওড়ায় সবচেয়ে কম, আর দু'পাড়ের উচ্চতা মোটামুটি সমান। দেখে আমারও তাই মনে হলো।

'এবার দেখতে হবে,' বললাম আমি, 'আমাদের কাঠগুলো যথেষ্ট লম্বা কিনা। চোখে দেখে মনে হচ্ছে চলবে। কিন্তু...'

'মা'র কাছে মোটা সুতোর গুটি আছে কয়েকটা,' বাধা দিয়ে বলে উঠলো আর্নেস্ট, 'ওর একটা নিয়ে আসি, এক মাথায় পাথর বেঁধে ছুঁড়ে দেবো ওপারে। তারপর পাথরটা টেনে নিয়ে আসবো একদম কিনারে। সুতো টান করে এ মাথায় একটা দাগ দেবো, ব্যস, সহজেই পেয়ে যাবো ঠিক মাপ।'

'চমৎকার বুদ্ধি বের করেছো, তাহলে দৌড়াও এক্ষুণি, সুতো নিয়ে এসো।'

কয়েক মিনিটের ভেতর সুতো এসে গেল। আর্নেস্টের বুদ্ধি অনুযায়ী মেপে দেখা গেল নদী এখানে আঠারো ফুট চওড়া। পাড়ের ভেতর দিকে দু'পাশে তিন ফুট তিন ফুট করে ধরলে দাঁড়ায় চব্বিশ ফুট। দেখা গেল আমাদের কাঠগুলোর বেশ কয়েকটাই চব্বিশ ফুটের চেয়েও বেশি লম্বা। এবারের সমস্যা হলো কাঠের এক প্রান্ত কি করে ওপারে পৌঁছানো যায়।

'ঠিক আছে,' বললাম আমি, 'চলো বাসায় যাই। খিদে পায়নি তোমাদের? খেতে খেতে এ নিয়ে আলাপ করা যাবে। কিছু একটা বুদ্ধি নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে।'

বাসায় এসে দেখি খাবার তৈরি। আরো দুটো জিনিস দেখালো আমার স্ত্রী, রান্নার ফাঁকে ফাঁকে তৈরি করেছে ও। পালের কাপড় দিয়ে বানানো দুটো থলে। বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে। মোটা সুই না থাকায় প্রতিটা ফোঁড় দেয়ার সময়ই পেরেক দিয়ে ফুটো করে নিতে হয়েছে কাপড়। ওর পরিশ্রমের প্রশংসা না করে পারলাম না।

খাওয়া শেষ করে নদীর তীরে ফিরে এলাম আবার। ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলেছি কি করে কাঠগুলো পাতবো নদীর ওপর। শক্ত একটা দড়ি বেঁধে ফেললাম লম্বা একটা কাঠের এক মাথার সঙ্গে। দড়ির অন্য প্রান্তে একটা পাথর বেঁধে ছুঁড়ে দিলাম ওপারে। তারপর একটা কপিকল নিয়ে সেই জল প্রপাতের কাছ

BanglaBook.org

দিয়ে ঘুরে আমিও চলে গেলাম ওপারে। পাড় থেকে একটু দূরে একটা বড় গাছের ডালে আটকালাম কপিকলটা। এরপর দড়িটা কপিকলের ভেতর দিয়ে চালিয়ে দিয়ে পাথর বাঁধা প্রান্তটা আবার ছুঁড়ে দিলাম ওপারে–যেখানে দাঁড়িয়ে আছে আমার ছেলেরা। আবার আমি নদী পেরিয়ে চলে এলাম এপারে। রশির মাথাটার সঙ্গে আরো দুটো ছোট রশি বাঁধলাম। এই রশি দুটোর একটা বেঁধে দিলাম গরুর গলায় অন্যটা গাধার গলায়। তারপর নদীর উল্টো দিকে যাওয়ার জন্যে তাড়া দিলাম প্রাণী দুটোকে। একটু একটু করে এগোতে লাগলো গরু-গাধা। একটু একটু করে কাঠটা এগোতে লাগলো নদীর ওপর দিয়ে। কয়েক মিনিট পর আনন্দের সাথে দেখলাম, কাঠের দড়ি বাঁধা প্রান্তটা পৌঁছে গেছে ওপাশে। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিৎস আর জ্যাক উঠে পড়লো ওটার ওপর। আমার নিষেধ সত্ত্বেও আস্তে আস্তে পার হয়ে গেল নদী। তারপর আবার সেই সরু সেতু বা কাঠের ওপর দিয়ে ফিরে এলো এপারে।

প্রথম কাঠটা বসিয়ে ফেলার পর অনেক সহজ হয়ে গেল কাজ। অল্প সময়েই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কাঠটা বসিয়ে ফেললাম নদীর ওপর। এবার ছোট ছোট তক্তা কেটে একটার সঙ্গে আরেকটা সাজিয়ে পেরেক মেরে যেতে হবে। সন্ধ্যার আগেই শেষ করে ফেললাম কাজটা। ফ্রিৎস মাপ মতো তক্তা কেটে দিলো করাত দিয়ে। আর্নেস্ট আর জ্যাক বয়ে আনলো, আমি পেরেক ঠুকে গেলাম।

কাজ যখন শেষ হলো, হঠাৎ করেই প্রচণ্ড ক্লান্তি ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের ওপর। তাঁবুতে ফিরলাম ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে। কোনো রকমে দুটো মুখে দিয়ে তলিয়ে গেলাম ঘুমের অতলে।

BanglaBook.org

নয়

পরদিন সকালে নাশ্‌তা খেয়েই পরিবারের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করলাম। দ্বীপে ওঠার পর প্রথম যে জায়গা আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলো সে জায়গাকে একটু আনুষ্ঠনিক ভাবে বিদায় জানাতে চাই। তাছাড়া ছেলেগুলোকে কিছু নির্দেশ দিতে হবে।

'এখন সম্পূর্ণ অজানা একটা জায়গায় যাচ্ছি আমরা,' শুরু করলাম আমি। 'ওখানকার পরিবেশ, বাসিন্দা–তারা মানুষ হোক আর জন্তু হোক–তাদের সম্পর্কে কিছুই জানি না। সুতরাং খুবই সাবধান হতে হবে আমাদের। সবাই এক সাথে থাকবো, কোন অবস্থাতেই ছুটোছুটি করে এগিয়ে যাওয়া বা পেছনে পড়া চলবে না। বুঝতে পেরেছো?'

নীরবে মাথা ঝাঁকালো ছেলেরা। এরপর ওদের বললাম আমাদের জন্তুগুলোকে নিয়ে আসতে। গরু আর গাধার পিঠে চাপানো হলো খাবার দাবার আর টুকটাক কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস। বাকি মালপত্র এখানেই রেখে যাচ্ছি আপাতত; পরে আস্তে আস্তে নিয়ে যাবো সব।

রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত আমরা, এমন সময় আমার স্ত্রী বললো, 'মুরগিগুলো যে রয়ে যাচ্ছে সে খেয়াল আছে?'

ওগুলোর কথা সত্যিই একদম মনে ছিলো না। আমতা আমতা করে বললাম, 'অ্যাঁ, তাইতো!'

'ওগুলো আমি রেখে যেতে পারবো না–নির্ঘাত শেয়ালে খাবে।'

লেগে গেল ছেলেরা মুরগি ধরার কাজে। কিন্তু দৌড়াদৌড়ি হলো কেবল, ধরতে পারলো না একটাও।

'এতক্ষণ ছোটাছুটি করে গা গরম করলে শুধু,' বললো এলিজাবেথ। 'এসো, দেখ, কি করে ধরতে হয়।'

'ও রকম মনে হচ্ছে,' বললো জ্যাক, 'চেষ্টা করেই দেখ, কেমন ধরতে পারো!'

'ঠিক আছে দেখি।' বলে তাঁবুর ভেতর থেকে মুঠো ভর্তি গম নিয়ে এলো এলিজাবেথ। তারপর গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা যে ভাবে হাঁস-মুরগি ডাকে সেভাবে ডাকতে লাগলো:

'আয়, আয়, তি-তি-তি...'

একটু পরেই দেখি গুটি গুটি পায়ে মুরগিগুলো এগিয়ে যাচ্ছে ওর দিকে। অল্প কিছু গম ছিটিয়ে দিলো ও, সেই সাথে পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে তাঁবুর দিকে। একটু পরেই ঢুকে পড়লো ভেতরে। তাঁবুর বাইরে ছিটানো গম শেষ করতে কয়েক সেকেণ্ড লাগলো পাখিগুলোর। আরো খাবারের লোভে ওরাও ঢুকে পড়লো তাঁবুর ভেতর। এবার মুঠোর বাকি গমটুকু ছিটিয়ে দিলো এলিজাবেথ। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে খেতে শুরু করলো মুরগিগুলো। চট করে এলিজাবেথ বন্ধ করে দিলো তাঁবুর মুখ।

বোকা বোকা চেহারা হয়েছে জ্যাকের। হাঁ করে তাকিয়ে আছে ও তাঁবুর মুখের দিকে। কিছুক্ষণ ঝটাপটির শব্দ হলো ভেতরে। একটু পরেই তাঁবুর মুখে এলিজাবেথকে দেখা গেল। সবগুলো মুরগি ওর হাতে ধরা।

পায়ে রশি বেঁধে গরু আর গাধার পিঠে ঝুলিয়ে নিলাম ওগুলো। তারপর পথে নামলাম আমরা। হাঁসগুলো রইলো এখানেই, খাঁড়ির জলে সাঁতার কেটে শামুক ঝিনুক খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।

ফ্রিৎস আর এলিজাবেথ একদম সামনে। ছোট্ট বানর ছানাটির জায়গা হয়েছে ফ্রিৎস-এর কাঁধে। ওদের পরেই গরুটা। তারপর গ্রিযল (গাধাটার এই নাম দিয়েছি আমরা)। এত দূরের পথ হাঁটতে কষ্ট হয়ে যাবে পিচ্চি ফ্রান্সিসের, তাই জিনিস পত্রের সঙ্গে ওকেও গাধার পিঠে বসিয়ে দিয়েছি। মজাসে চারপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছে ও। গাধার পরে জ্যাক, ছাগলগুলোকে টেনে নিয়ে চলেছে। এর পরেই ভেড়াগুলো নিয়ে আর্নেস্ট। সবশেষে আমি, কাফেলার পেছনটার তদারকি এবং পাহারাদারির কাজ করছি। আমাদের কুকুর দুটো একবার সামনে একবার পেছনে ছুটে ঠিক রাখছে জন্তুগুলোকে–যেন বেপথে চলে না যায়।

নদীর পাড়ে পৌঁছে নিরাপদে, কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই সেতু

পার হলাম। তারপরই পেছনে একটা ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ শুনে চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখা, আমাদের সেই বদরাগী মাদী শুয়োরটা ছুটতে ছুটতে আসছেন। জাহাজ থেকে আনার পর সেই যে ছেড়ে দিয়েছিলাম, আর কোনো খোঁজ খবর রাখিনি ওর। অমন বেয়াড়া জন্তুর খোঁজ রাখতে যায় কে? এই কদিন কোথায় ছিলো, কি খেয়েছে কিছুই জানি না। এখন বুঝতে পারছি আমাদের আশেপাশেই ছিলো জানোয়ারটা। যে মুহূর্তে দেখেছে আমরা চলে যাচ্ছি তখন বোধহয় নিঃসঙ্গতার ভয়েই ছুটে এসেছে পেছন পেছন।

ব্যাটা ভয় পেয়ে ছুটে এসেছে তবু মেজাজ কি! ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে সেতু পেরোলো। তারপর সবাইকে ছাড়িয়ে ছুটে গেল সামনের দিকে।

নদী পার হয়ে কিছুদূর হাঁটার পর শুরু হলো ঘাসের বন। বড় বড় সবুজ ঘাসের সমারোহ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি। মুগ্ধ হলো আমাদের জন্তুগুলোও। এলো-মেলো হয়ে ছুটে গেল ওরা সেই ঘাস খাওয়ার জন্যে। বহু চেষ্টা করেও ওদের আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত টার্ক আর পনটোকে লেলিয়ে দিতে হলো। সমানে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ঘেউ ঘেউ করে ওরা আবার পথে নিয়ে এলো গরু-গাধা-ছাগল-ভেড়াগুলোকে। এ ধরনের ঘটনা আবার যেন না ঘটে সেজন্যে ঘাসবন ছেড়ে সাগর পাড় ঘুরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। ওখানে এত ঘাস নেই, সুতরাং আশা করা যায় শান্ত থাকবে তৃণভোজীর দল।

আমরা সাগর তীরে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই ভয়ানক ভাবে গর্জন করে উঠলো কুকুর দুটো। হিংস্র কোনো জন্তুর মুখোমুখি হয়েছে যেন। সেদিন রাতে শেয়ালের দল যখন হামলা চালিয়েছিলো তখনও এমন করেই গর্জন করছিলো ওরা। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ফ্রিৎস। এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো থমকে। তারপর ছুটে চলে গেল একপাশে। ছুটতে ছুটতেই কাঁধ থেকে বন্দুক খুলে হাতে নিয়েছে। এক সেকেণ্ড পরই আগুন বেরোতে দেখলাম ওর বন্দুকের নল থেকে। এদিকে জ্যাকও ছুটেছে ফ্রিৎস-এর পেছন পেছন। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর ঘটে গেল এতগুলো ঘটনা। এবার আমিও ঘুরে ওদের সাহায্য করার জন্যে ছুটলাম।

কিন্তু সাহায্য করার কিছু ছিলো না। যা করার ওরাই করে ফেলেছে। দু'হাতে তালি বাজাতে বাজাতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে জ্যাক। আমার দিকে তাকিয়ে লাফাচ্ছে আর চিৎকার করছে, 'তাড়াতাড়ি এসো, বাবা, তাড়াতাড়ি! দেখে যাও কি বিরাট একটা শজারু!'

সত্যিই বিরাট একটা শজারুকে আহত করেছে ফ্রিৎস। কুকুর দুটো অস্থির ভাবে ছোটাছুটি করছে সেটার চারপাশে। আহত অবস্থায়ও পালানোর চেষ্টা করছে শজারুটা। পারছে না টার্ক আর পনটোর জন্যে। শজারুর কাঁটা লেগে রক্তাক্ত হয়ে গেছে বেচারাদের নাক। আমি পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই কোমরের বেল্ট থেকে পিস্তল খুললো জ্যাক। নিশানা করলো এক মুহূর্ত, তারপর টেনে দিলো ঘোড়া। শেষ একটা লাফ দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো শজারুটা।

আর্নেস্ট আর ফ্রিৎস এগিয়ে গেল ওটাকে তুলে নেয়ার জন্যে। কিন্তু হাতে কাঁটা ফোটানো ছাড়া আর কিছু করতে পারলো না।

'নাহ্, ফেলে রেখেই যেতে হচ্ছে এটাকে,' অবশেষে বললো ওরা।

'অসম্ভব,' চিৎকার করলো জ্যাক, 'দুনিয়া উল্টে গেলেও আমি এটা রেখে যাচ্ছি না! মা-কে দেখাবো না?'

পকেট থেকে রুমাল বের করে তার একটা কোনা শজারুটার গলায় বাঁধলো ও। তারপর অন্য কোনা ধরে টেনে নিয়ে গেল সামনে, যেখানে ওর মা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

'এই যে, মা, দৈত্যটা,' বললো ও, 'হাজার বল্লমে সুসজ্জিত। আমিও বাবা কম নই, এক গুলিতেই কম্ম কাবার করে দিয়েছি।'

কুকুরগুলোর নাক থেকে আমি আর এলিজাবেথ শজারুর কাঁটা ছাড়িয়ে দিলাম। আর্নেস্ট আর ফ্রিৎস নিজেরাই ছাড়ালো যার যার হাতের কাঁটা।

'এবার ওটা কি করবে, জ্যাক?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কেন, নিয়ে যাবো! তুমিই তো সেদিন বলছিলে শজারুর গোশত খেতে খুব মজা!'

সুতরাং গাধার পিঠে চাপিয়ে নিলাম শজারুটাকে। ফ্রান্সিসের গায়ে যেন কাঁটা লাগতে না পারে সেজন্যে আগে একটা কম্বলে মুড়ে দিলাম।

আবার এগিয়ে চললো আমাদের কাফেলা। অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেলাম এলিজাবেথের সেই বিশাল গাছগুলোর কাছে। বিস্ময়ে প্রথমে কোনো কথা বলতে পারলাম না আমি। এত বড় গাছ জীবনে কখনো দেখিনি।

'কি লম্বা!' অবশেষে স্বর বেরুলো আমার গলা দিয়ে। 'গুঁড়িগুলো কি মোটা! সত্যিই চমৎকার একটা জায়গা বেছেছো তুমি! ঐ উঁচু ডালে নিঃসন্দেহে নিরাপদে থাকবো আমরা। গেছো ভাল্লুকও যদি আসে, অত উপরে উঠতে পারবে না!'

গরু এবং গাধার পিঠ থেকে মালপত্র সব নামিয়ে নিয়ে ছাগল-ভেড়াগুলোর সাথে ওদেরও ছেড়ে দিলাম চরে বেড়ানোর জন্যে। তবে প্রত্যেকটার সামনের পাগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলাম যাতে বেশি দূরে চলে না যায় বা হারিয়ে না যায়। মুরগিগুলোকেও ছেড়ে দিলাম। গাছগুলোর আশেপাশে কি আছে দেখে নিলাম একবার। কাছেই একটা ঝরনা দেখলাম। দূরে ঝোপ ঝোপ মতো কিছু গাছ। এছাড়া আপাতত আর কিছু নজরে পড়লো না।

সবুজ ঘাসের ওপর হাত পা ছড়িয়ে বসলাম আমি আর আমার স্ত্রী। ছেলেরা ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে। ওদের প্রাণশক্তি দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারি না। এতদূর হেঁটে এসেও একটু ক্লান্ত হয়নি।

এবার কি কি কাজ করবো, কোনটা আগে করতে হবে কোনটা পরে পরামর্শ করতে লাগলাম আমরা স্বামী-স্ত্রীতে। হঠাৎ একটা গুলির শব্দ ভেসে এলো। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। ব্যাপার কি? ছেলেদের কে কোথায় দেখার জন্যে চারপাশে তাকালাম।

আর্নেস্ট এক জায়গায় আগুন জ্বালবার ব্যবস্থা করছে। পিচ্চি ফ্রান্সিস ওকে সাধ্যমতো সাহায্য করছে শুকনো পাতা, ডাল-পালা এনে দিয়ে। জ্যাক ঘোরাঘুরি করছে একটা ঝোপের ধারে। ফ্রিৎসকে দেখছি না কোথাও। তার মানে গুলিটা ফ্রিৎসই ছুঁড়েছে। গুলির আওয়াজ যেদিক থেকে এসেছে সেদিক লক্ষ্য করে এগোলাম আমি।

দশ পা-ও যেতে পারিনি, একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ফ্রিৎস। ওর এক হাতে বন্দুক, অন্য হাতে ঝুলছে মৃত একটা জন্তু। ওটা দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি।

'বাবা, এটা মেরেছি,' উত্তেজনায় কাঁপা কাঁপা গলায় বললো ফ্রিৎস।

'দারুণ একটা কাজ করেছো, ফ্রিৎস,' বললাম আমি। 'আমাদের মোরগ, মুরগি, হাঁসগুলো এ যাত্রা বেঁচে গেল। এই জন্তুটা এক রাতেই শেষ করে দিতে পারতো সবগুলোকে।'

'কি জন্তু এটা, বাবা?'

'টাইগার ক্যাট। ভীষণ হিংস্র। বনের যত নিরীহ পাখি আছে সব খেয়ে সাফ করে ফেলে। কখনো কখনো মানুষ, ভেড়া বা ছাগলও রক্ষা পায় না এদের হাত থেকে। এটাকে মেরে খুব ভালো কাজ করেছো।'

'আমি এটার চামড়া ছাড়িয়ে রাখবো।'

'ভালো। জ্যাকের মতো তুমিও একটা বেল্ট বানিয়ে নিতে পারবে। বাকি চামড়া দিয়ে ছুরি, কাঁটা, চামচ এসব রাখার মতো ছোট ছোট কয়েকটা থলে বানানো যাবে।'

'আমিও, বাবা, শজারুটার চামড়া ছাড়িয়ে রাখবো,' বললো জ্যাক।

'নিশ্চয়ই, তবে খেয়াল রেখো মাংসটা নষ্ট করে ফেলো না।'

দু'ভাই চামড়া ছাড়াতে চলে গেল। এই সময় ফ্রান্সিস এলো দৌড়াতে দৌড়াতে। মুখ ভর্তি কি যেন ওর। চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি জিনিসটার স্বাদ খুব ভালো লাগছে ওর কাছে।

'মা! মা!' উৎফুল্ল স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো ফ্রান্সিস। 'খুব মজার ফল পেয়েছি আমি। তোমার জন্যেও নিয়ে এসেছি।'

ঘুষ পেয়ে মোটেই খুশি হলো না ওর মা। বরং ব্যাকুল গলায় বললো, 'ও, ফ্রান্সিস, কি মুখে দিয়েছো তুমি? বের করো এক্ষুণি! বিষাক্ত কিছু হতে পারে।' বলতে বলতে ফ্রান্সিসকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো এলিজাবেথ। 'হাঁ করো, হাঁ করো দেখি!'

কিন্তু কিছুতেই হাঁ করতে রাজি হলো না ফ্রান্সিস। শেষ পর্যন্ত ওর মা জোর করে মুখের ভেতর আঙুল দিয়ে বের করে আনলো আধ-খাওয়া জিনিসগুলো। হাতে যেগুলো ছিলো সেগুলোও কেড়ে নিলো।

'আরে এ দেখছি ডুমুর!' অবাক গলায় বললাম আমি। 'যাক বাবা, বিষাক্ত কিছু নয়! কোথায় পেয়েছো, ফ্রান্সিস?'

'ঐ যে ওখানে, ঘাসের ভেতর। আরো অনেক আছে! মুরগিরা খাচ্ছে।'

'যা-ই হোক আর কখনো কোনো জিনিস আমাকে বা তোমার মাকে না দেখিয়ে মুখে দেবে না, কেমন? যদি বিষাক্ত হতো?'

'কি করে বুঝলে এগুলো বিষাক্ত নয়?' জিজ্ঞেস করলো এলিজাবেথ।

'বিষাক্ত হলে এতক্ষণ বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যেত। যাহোক, তবু নিশ্চিত হয়ে নেয়াই উচিত। কোনটা বিষাক্ত কোনটা বিষাক্ত নয় তা আমাদের চেয়ে জীব জানোয়ারেরা অনেক ভালো বোঝে। ওদের খাইয়ে দেখি আগে।'

BanglaBook.org

একটু দূরে মাটিতে বসে খেলা করছে ফ্রিৎস-এর বানরছানা। ওটার কাছে গিয়ে ফ্রান্সিসের আনা একটা ডুমুর এগিয়ে দিলাম। চটপট সেটা হাত বাড়িয়ে নিলো বানরের বাচ্চা। এক পলক দেখে খেতে শুরু করলো। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম আমি। কিছুই হলো না বানর ছানাটার। ফ্রান্সিসের দিকেও তাকালাম একবার। এখনও অসুস্থতার কোনো লক্ষণ নেই ওর ভেতর।

'না, বিষাক্ত নয়,' অবশেষে ঘোষণা করলাম আমি। তারপর ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় পেয়েছো এগুলো?'

হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিলো ও। আমি এগিয়ে গেলাম সে জায়গার দিকে। ফ্রান্সিসের কথাই ঠিক, অসংখ্য ডুমুর পড়ে আছে মাটিতে, খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে মুরগিগুলো। প্রথমে বুঝতে পারলাম না, কোত্থেকে এলো এ ফল। এক মুহূর্ত ভেবে মুখ তুলে তাকালাম উপর দিকে। হাসি ফুটে উঠলো আমার মুখে।

'তোমার এই দানবের মতো গাছগুলো আসলে এক ধরনের ডুমুর গাছ,' বললাম আমি। 'একটু ঝুঁকে কুড়িয়ে নিলেই হলো। পেয়ে যাচ্ছো খাদ্য।'

এরপর চার ছেলেকে এক জায়গায় জড়ো করলাম আমি। কোনো নতুন জিনিস যেন হুট করে মুখে না দেয় সে সম্পর্কে কড়াকড়ি নির্দেশ দিলাম। আর ওদের মা খাবারের আয়োজনে লাগলো। রান্না হলো শজারুর মাংস।

BanglaBook.org

দশ

খেতে খেতে পরবর্তী করণীয় ঠিক করা হলো।

'আজ রাতটা নিচেই কাটাতে হবে,' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম আমি। 'বিকেল হতে বেশি বাকি নেই। এর ভেতর গাছের ওপর ঘর বানানো সম্ভব নয়। তবে চেষ্টা করবো আজকের মধ্যেই একটা মই বানিয়ে ফেলতে, তাহলে কাল সকাল থেকেই ঘর বানানোর কাজ শুরু করা যাবে। খেয়ে উঠেই গরু আর গাধাটাকে নিয়ে সাগর পাড়ে চলে যাবো আমি, ফ্রিৎস আর আর্নেস্ট, জোয়ারে ভেসে আসা কাঠ খুঁটি যদি কিছু যোগাড় করা যায়। ঘর বানাতে প্রচুর কাঠ লাগবে, মই বানাতেও। ডুমুর গাছগুলোর শুকনো ডাল ব্যবহার করা যাবে না। পরীক্ষা করে দেখেছি, সামান্য চাপেই মট করে ভেঙে যায়।'

খাওয়া শেষ করে উঠে গেল এলিজাবেথ। গরু আর গাধাটাকে খেদিয়ে নিয়ে এলো। এই ফাঁকে কয়েকটা কাজ সেরে ফেললাম আমি।

প্রথমে জাহাজী দোলনাগুলো ঝুলিয়ে দিলাম কয়েকটা নিচু ডালের সঙ্গে। তারপর বড় একটুকরো পালের কাপড় মেলে দিলাম সেগুলোর ওপর। রাতে শিশির এবং পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচাবে আমাদের কাপড়টা। রাত কাটানোর ব্যবস্থা হয়ে গেল। এবার সন্ধ্যার আগে আগে যতটা সম্ভব এগিয়ে রাখতে হবে ঘর বানানোর কাজ।

আর্নেস্ট আর ফ্রিৎসকে নিয়ে সাগর পাড়ের দিকে রওনা হলাম আমি।

যাওয়ার আগে জ্যাককে বলে গেলাম, 'মা আর ছোট ভাইয়ের দায়িত্ব রইলো তোমার ওপর। আমরা যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ ওদের ছেড়ে কোথাও যাবে না। তোমার ওপর নির্ভর করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, বাবা!'

সাগর তীরে পৌঁছে দেখলাম কাঠের ছড়াছড়ি সৈকতে—নানা আকারের, নানা ধরনের। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মইয়ের ধাপ বানানোর মত ছোট কাঠ দেখলাম না একটাও। অগত্যা কি আর করা, বড় কাঠই কেটে ছোট করে নিতে হবে। কাজের মধ্যে আমার খাটুনি একটু বাড়বে এই আর কি।

গরু আর গাধার পিঠে যতটা করে সম্ভব কাঠ চাপালাম, আমরাও যতখানি সম্ভব তুলে নিলাম কাঁধে। ফিরে এলাম বিশাল গাছগুলোর কাছে।

বড় বড় কাঠ কেটে মইয়ের ধাপ বানানোর কাজ শুরু করলাম সময় নষ্ট না করে। কি প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হবে কল্পনা করে শিউরে উঠছি, সেই সাথে দেরি হয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তাও পীড়িত করছে মনকে। ভেবেছিলাম আজকের ভেতরই তৈরি করে লাগিয়ে ফেলবো মইটা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা সম্ভব হবে না।

যাহোক মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করে শুরু করলাম কাজ। একটা কাঠ সবে মাপ মতো কেটেছি, এমন সময় ছুটতে ছুটতে এলো আর্নেস্ট। জানালো কিছু দূরে একটা জলার ধারে বিরাট এক বাঁশঝাড় আবিষ্কার করেছে ও।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম আমি। বাঁশ দিয়ে খুব চমৎকার মই হয়। ছোট একটা কুঠার নিয়ে ছুটলাম আর্নেস্টের পেছন পেছন। দূরে ঝোপ ঝোপ মতো যে গাছগুলো দেখেছিলাম সেখানেই বাঁশঝাড়। পৌঁছে দেখলাম, মইয়ের জন্যে আমার যে রকম দরকার ঠিক সেরকম বাঁশ প্রচুর পরিমাণে আছে সেখানে।

বেশ কয়েকটা বাঁশ গোড়া থেকে কেটে কেটে নিয়ে ডাল পাতা ছাড়িয়ে চার-পাঁচ ফুট লম্বা করে টুকরো করে ফেললাম। ইতিমধ্যে ফ্রিৎস আর জ্যাকও হাজির হয়েছে। দশ বারোটা করে বাঁশের টুকরো এক সাথে বেঁধে কয়েকটা বোঝা তৈরি করলো ওরা। একেক জনে একেকটা বোঝা কাঁধে নিয়ে রওনা হলাম বিশাল গাছগুলোর দিকে। পনটোও কখন জানি যোগ দিয়েছে আমাদের সাথে। এখন আগে আগে চলেছে সে।

হঠাৎ একটা ঝোপের দিকে তেড়ে গেল পনটো ঘেউ ঘেউ করতে করতে। সচকিত হয়ে উঠলাম আমি। বাঁশের বোঝা ফেলে বন্দুক হাতে নিলাম। আমার দেখাদেখি ফ্রিৎসও।

কয়েক সেকেণ্ড পর এক ঝাঁক ফ্ল্যামিঙ্গো ডানা ঝাপটে আকাশে উঠলো ঝোপের ওপাশ থেকে। পাখিগুলো দেখে পনটোর চিৎকার আরো বেড়ে গেল। আনন্দসূচক একটা ধ্বনি বেরোলো ফ্রিৎস-এর গলা দিয়ে। পর মুহূর্তে গর্জে উঠলো ওর বন্দুক। উড়তে উড়তেই আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল দুটো পাখি। ধপ ধপ করে মাটির ঢেলার মতো আছড়ে পড়লো নিচে।

ছুটে গেলাম আমরা। ঝোপের ওপাশে একটা জলা। সেখান থেকে উড়েছে ফ্ল্যামিঙ্গোগুলো। জলার ধারে পৌঁছে দেখলাম, একটা পাখি মারা গেছে, জলায় পড়ছে সেটা। অন্যটা আহত, এক ডানায় গুলি লেগেছে, পড়েছে ডাঙায়।

আমাদের সাড়া পেয়েই ভালো ডানাটা ঝাপটে পালানোর চেষ্টা করলো সে। কিন্তু পালানোর সুযোগ দিলো না তাকে পনটো। প্রচণ্ড এক গর্জন করে ছুটে গিয়ে কামড়ে ধরলো ভালো ডানাটা। তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ কুকুরটার হাত থেকে রক্ষা করলাম আমি পাখিটাকে। এদিকে হাঁটু পর্যন্ত জলায় নেমে মরা পাখিটাকে তুলে এনেছে ফ্রিৎস।

একটা ফ্ল্যামিঙ্গো এখনো জীবিত আছে দেখে সেকি খুশি ছেলেগুলো! একটার পর একটা প্রশ্ন করে গেল ওরা।

'বাবা, আমরা পুষতে পারি না পাখিটা? ডানায় গুলি লাগলে মরে যায় পাখি? ভালো করে যত্ন নেবো পাখিটার, ওর ডানা ভালো করে তুলবো। তারপর, বাবা, পোষ মানবে না?'

'যতদূর জানি,' বললাম আমি, 'সহজেই পোষ মানে ফ্ল্যামিঙ্গো।'

'তাহলে আমরা পুষবো,' এক সাথে চিৎকার করলো তিন ছেলে, একটু আব্দারের সুর ওদের গলায়।

'ভালো কথা, কিন্তু মুরগির খাবার খাওয়ালে বাঁচবে না এ পাখি।'

'ও যা খায় তা-ই খাওয়াবো আমরা। কি খায় ফ্ল্যামিঙ্গো?'

'ছোট মাছ, পোকামাকড়।'

'তাই খাওয়াবো আমরা। নদীতে গিয়ে মাছ ধরে আনবো। আর পোকামাকড় তো প্রচুর পাওয়া যাবে।'

'বেশ, তাহলে নিয়ে চলো।'

আবার রওনা হলাম বাড়ির পথে।

অবশেষে আমাদের সেই বিশাল গাছগুলোর কাছে পৌঁছুলাম। সবাই খুব খুশি। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা জিনিস—বাঁশের খোঁজ পেয়েছি, কিছু নিয়েও এসেছি সঙ্গে করে। সেই সাথে খাবার হিসেবে একটা ফ্ল্যামিঙ্গো। পুষবার জন্যেও একটা।

এলিজাবেথ কিন্তু মোটেও খুশি হলো না জ্যান্ত পাখি দেখে।

'যেগুলো আছে সেগুলোকে কি খাওয়াবো ঠিক নেই,' ঝামটে উঠলো ও, 'তার ওপর আবার নতুন একটা নিয়ে এসেছো!'

'অত দুশ্চিন্তার কিছু নেই,' একটু হেসে আমি বললাম। 'যখন আর ওদের খাওয়ানোর মতো খাবার থাকবে না তখন ওরাই আমাদের খাবার হবে।'

এবার একটু শান্ত হলো আমার স্ত্রী। আমি পরীক্ষা করলাম পাখিটাকে। আঘাত খুব মারাত্মক কিছু নয়। মাখন আর মদ মিশিয়ে একটা মলম তৈরি করে লাগিয়ে দিলাম ক্ষতস্থানে। লম্বা একটা রশি দিয়ে পাখিটাকে বেঁধে রাখলাম একটা খুঁটির সাথে।

এরপর জাহাজ থেকে আনা মোটা রশির কুণ্ডলীটা মেপে ফেলতে বললাম ফ্রিৎস আর আর্নেস্টকে। মইয়ের জন্যে কমপক্ষে আশি ফুট রশি দরকার আমার। জ্যাক আর ফ্রান্সিসকে লাগিয়ে দিলাম যেখানে যত সরু দড়ি আছে সব খুঁজে এনে ওর মা-র কাছে দেয়ার জন্যে। আমি বসলাম বাঁশ চিরতে। একটা ধনুক আর কিছু তীর বানাবো।

BanglaBook.org

চলনসই একটা ধনুক আর কয়েকটা তীর বানিয়ে ফেললাম অল্প সময়েই। তাতে সোজা ছোটে সেজন্যে তীরগুলোর লেজের কাছে লাগিয়ে দিয়েছি ফ্ল্যামিঙ্গোর পালক। ইতিমধ্যে রশি মাপার কাজ শেষ করেছে ফ্রিৎস আর আর্নেস্ট।

'আশি ফুটের চেয়ে অনেক বেশি আছে দড়ি, প্রায় পঁচিশ ফ্যাদম,' এক সাথে বললো দু'জন। পরমুহূর্তে চোখ গেল তীর ধনুকের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ করে উঠলো ওরা, 'আরে, ধনুক! ধনুক! তীরও। বলো না, বাবা, কি করবে তীর-ধনুক দিয়ে? আমাকে একটা ছুড়তে দাও না! আমাকে! আমাকেও!' শেষ কথাটা বললো পিচ্চি ফ্রান্সিস।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, ধৈর্য ধরো,' বললাম আমি। 'জরুরি একটা কাজ করার জন্যে বানিয়েছি এগুলো। আগে দেখি কাজটা হয় কিনা তারপর তোমরা নিও খেলা করার জন্যে।' এলিজাবেথের দিকে ফিরে বললাম, 'তোমার কাছে শক্ত সুতো আছে?'

'দাঁড়াও দেখি, আমার যাদুর থলে কি বলে।' উঠে আমাদের স্তূপ করে রাখা মাল পত্রের কাছে চলে গেল ও। ফিরে এলো ওর পেটমোটা ঝোলাটা নিয়ে। তারপর মিটি মিটি একটু হেসে ঝোলাটা মুখের কাছে নিয়ে বিড়বিড় করে বললো, 'আমার স্বামী কিছু সুতো চায়, খুব শক্ত সুতো–হবে?' থলেটা কানের কাছে ওঠালো ও। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে একবার মাথা ঝাঁকালো, তারপর আমার দিকে ফিরে বললো, 'হবে।'

আমি ওর ভঙ্গি দেখে হেসে হাত বাড়িয়ে বললাম, 'দাও।'

একটা তীরের লেজের দিকে শক্ত করে বাঁধলাম সুতোর এক মাথা। তারপর তীরটা ধনুকে লাগিয়ে আকাশের দিকে তাক করলাম। ছিলা টেনে ছেড়ে দিতেই লেজে সুতো নিয়ে ছুটলো তীর। হাঁ করে চেয়ে আছে ছেলেরা। আমিও। হ্যাঁ, একেবারেই হয়ে গেছে কাজ। প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচুতে মোটা একটা ডালের এপাশ দিয়ে ঘুরে ওপাশ দিয়ে পড়েছে তীর। এবার নিচ থেকে আমি সুতো ঢিল দিতেই লেজে সুতো নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে এলো তীরটা। এরপর সুতোর সঙ্গে একটা মোটা দড়ির প্রান্ত বেঁধে দিলাম। সুতোর তীর বাঁধা প্রান্ত ধরে টান দিতেই ওপরে উঠে গেল দড়ি। ডালের ওপর দিয়ে ঘুরে নেমে এলো নিচে।

মই বানাতে বসলাম এবার। মোটা দড়ির কুণ্ডলী থেকে প্রায় একশো ফুট লম্বা একটা টুকরো কেটে নিয়ে সমান দু'ভাগ করলাম সেটা। সমান একটা জায়গা বেছে নিয়ে সমান্তরাল করে বিছিয়ে দিলাম টুকরো দুটো। একটা থেকে অন্যটার দূরত্ব রাখলাম এক ফুট। ফ্রিৎসকে বললাম বাঁশের টুকরোগুলো দু'ফুট দু'ফুট মাপে কেটে ফেলতে। আর্নেস্ট দু'ফুটি টুকরোগুলো এনে দিতে লাগলো আমার কাছে। আর আমি বাঁশের টুকরোগুলো সরু দড়ি দিয়ে মোটা দড়ির সাথে বেঁধে দিতে লাগলাম একটা একটা করে। মইয়ের এক ধাপ থেকে অন্য ধাপের দূরত্ব রাখলাম বারো ইঞ্চি। আধ ঘণ্টারও কম সময়ের ভেতর তৈরি হয়ে গেল চল্লিশ ফুট লম্বা মইটা।

মইয়ের এক প্রান্ত এবার কষে বাঁধলাম গাছের ডাল থেকে ঝুলে থাকা দড়ির সাথে। দড়ির অন্য প্রান্ত ধরে টান দিলাম ধীরে ধীরে। ওপরে উঠতে লাগলো মই।

BanglaBook.org

এক সময় পৌঁছে গেল ওটা মোটা ডালটার কাছে। এবার একজনকে উঠে মইটা ডালের সঙ্গে আটকে দিতে হবে। চার ছেলেই লাফিয়ে উঠলো:

'আমি উঠবো! আমি উঠবো!'

জ্যাককে বেছে নিলাম আমি। ও সবচেয়ে চটপটে আর হালকা। ফ্রান্সিস অবশ্য আরো হালকা তবে ও এত ছোট যে ওকে ওপরে পাঠানোর সাহস পেলাম না।

আমরা নিচ থেকে শক্ত করে দড়ি টেনে ধরে রইলাম। তরতর করে উঠে গেল জ্যাক। মিনিট খানেকের ভেতর ও পৌঁছে গেল ওপরে। কিন্তু অত মোটা দড়ি পেঁচিয়ে মইটাকে ডালের সাথে বাঁধতে পারলো না জ্যাক। এবার এগিয়ে এলো ফ্রিৎস। বললো, সে-ও জ্যাকের মতোই অনায়াসে উঠে যেতে পারবে।

'ঠিক আছে, যাও,' বললাম আমি। 'কিছু পেরেক আর একটা হাতুড়ি নিয়ে যাও। মইয়ের একদম ওপরের ধাপটা পেরেক মেরে দেবে ডালের সঙ্গে।'

উঠে গেল ফ্রিৎস। একটু পরেই মইটা ও ডালের সঙ্গে, বেঁধে পেরেক মেরে দিলো। সর্বশক্তিতে টান দিয়ে দেখলাম যথেষ্ট শক্ত ভাবে আটকেছে মই। একটা কপিকল নিয়ে উঠতে শুরু করলাম আমি।

উপরে উঠে প্রথমেই আরো মজবুত করে মইটা আটকালাম ডালের সঙ্গে। নাগালের মধ্যেই একটু উপরে আরেকটা ডালে আটকে দিলাম কপিকলটা। ঝুলে থাকা দড়িটা উঠিয়ে এনে আবার নামিয়ে দিলাম কপিকলের ওপর দিয়ে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এই দড়িতে বেঁধে ওঠানো যাবে। কপিকলটা থাকায় আমাদের পরিশ্রম অনেক বাঁচবে।

ছেলেদের নিয়ে নেমে এলাম গাছ থেকে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আজ আর কোনো কাজ নয়। এবার খেয়েদেয়ে ঘুম। কাল ভোরে উঠে লাগতে হবে গাছের ওপর ঘর বানানোর কাজে।

আমাদের সব জন্তুগুলোকে গাছের গোড়ায় এনে বেঁধে রাখলাম। মুরগিগুলোও কক কক করতে করতে এসে পড়লো। আমাদের কাছাকাছি কিছুক্ষণ ঘুর ঘুর করে ওরা একে একে উঠে পড়লো মইয়ের একেকটা ধাপে। ফ্রিৎস বিস্কুট দুধে ভিজিয়ে খাইয়ে এলো ফ্ল্যামিঙ্গোটাকে। একই জিনিস খাওয়ালো তার বানর ছানাকেও।

এরপর রাতের খাওয়া খেতে বসলাম আমরা। এবার আর শজারুর মাংস নয়, রুটি, পনির আর ডুমুর পরিবেশন করলো আমার স্ত্রী।

খেয়ে উঠেই আমরা যার যার দোলনায় উঠে পড়লাম। সারা দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত শরীরগুলো শিগগিরই তলিয়ে গেল ঘুমের অতলে।

BanglaBook.org

এগারো

পরদিন খুব ভোরে উঠে শুরু করলাম ঘর তৈরির কাজ। ছোট তিন ছেলে আর গাধাটাকে সঙ্গে নিয়ে এলিজাবেথ চলে গেল সাগর পাড়ে। গতকাল আমরা যেসব কাঠ আনতে পারিনি সেগুলো ওরা নিয়ে আসবে। ইতিমধ্যে যদি নতুন কাঠ জোয়ারে ভেসে এসে থাকে সেগুলোও নিয়ে আসবে। ফ্রিৎস আর আমি উঠে গেলাম গাছের ওপর। যে ডালের সাথে মই বেঁধেছি গাছের গুঁড়ি থেকে মাটির প্রায় সমান্তরালে বিস্তৃত সেটা। সামান্য দূরে একই রকম মাটির সমান্তরাল আরেকটা ডাল আছে। এই দুটো ডালের ওপর তক্তা বা বাতা বসিয়ে একটা পাটাতন তৈরি করবো ঠিক করেছি।

প্রথমেই মোটা ডাল দুটো থেকে গজানো ছোট ছোট ডাল আর পাতা ছেঁটে ফেললাম। এতে বেশ সময় লাগলো। পরিশ্রম-ও নেহায়েত কম হলো না।

ডাল-পাতা ছেঁটে ফেলে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছি, এই সময় গাধার পিঠে কাঠ বোঝাই দিয়ে ছেলেদের সাথে ফিরে এলো আমার স্ত্রী। ছেলেদের কাঁধেও কাঠ। যে যতটা পেরেছে বয়ে এনেছে। এলিজাবেথও খালি হাতে আসেনি। আমার পরিবারের সদস্যদের এই পরিশ্রমী চেহারা দেখে গর্বে বুক ভরে উঠলো।

এর পর শুরু হলো আসল কাজ। আর্নেস্ট, জ্যাক আর এলিজাবেথ রইলো নিচে। কপিকলের সঙ্গে লাগানো দড়ির মাথায় ওরা বেঁধে দিচ্ছে একটা করে লম্বা তক্তা অথবা মোটা বাতা। আমি আর ফ্রিৎস ওপর থেকে টেনে তুলছি সেগুলো। কিছুক্ষণের ভেতর দুই ডালকে কড়ি হিশেবে ব্যবহার করে বেশ কয়েকটা মোটা তক্তা গায়ে গায়ে লাগিয়ে সাজিয়ে ফেললাম। মোটামুটি যখন আমাদের দাঁড়ানোর মতো একটা জায়গা হলো তখন বসলাম হাতুড়ি পেরেক নিয়ে। একে একে সবগুলো তক্তা পেরেক দিয়ে শক্ত করে আটকে দিলাম দুই ডালের সঙ্গে। দুপুর নাগাদ গাছের ওপর চমৎকার একটা পাটাতন তৈরি হয়ে গেল । এবার এই পাটাতনের চারদিকে দেয়াল বানাতে হবে আর ওপরে দিতে হবে আচ্ছাদন।

দেয়াল বানানোটা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। তাছাড়া এর জন্যে যত দরকার তত কাঠ নেই আমাদের কাছে। আপাতত সিদ্ধান্ত নিলাম চারদিক থেকে রেলিং লাগিয়ে ঘিরে ফেলবো পাটাতনটা। এ কাজটা করতেই হবে। মাটি থেকে পাটাতনের উচ্চতা চল্লিশ ফুটের বেশি, অত উঁচু থেকে পড়লে আর রক্ষা নেই। পিচ্চি ফ্রান্সিসকে নিয়েই সবচেয়ে ভয়।

দুপুরে খাওয়ার পর আবার কাজ শুরু। বিকেল নাগাদ রেলিং দিয়ে পাটাতনটা ঘিরে ফেলা গেল। মইটা যেখানে পাটাতনের সঙ্গে মিশেছে সেখানে ছোট্ট একটা দরজা রেখেছি, ওটা ইচ্ছে মতো লাগানো বা খোলা যায়।

এরপর আমি নিচে নেমে দোলনাগুলো খুলে ফেললাম ডাল থেকে। যেভাবে পাটাতনের কাঠ উঠিয়েছি সেই একই উপায়ে দোলনাগুলোও তুলে নিলাম উপরে।

পাটাতনের ওপর দিককার কয়েকটা ডালের সঙ্গে আবার বেঁধে দিলাম সেগুলো। শোয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। এবার শিশির আর পোকামাকড় ঠেকানো। নিচে যে পালের কাপড়টা টানিয়ে দিয়েছিলাম সেটাই মুড়ে ছোট একটা গাঁট বানিয়ে ওপরে তুলে এনে দোলনাগুলোর ওপর দিয়ে মেলে দিলাম সেটা। লম্বা দুটো পাশ ঝুলে রইলো পাটাতনের দু'পাশে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল আমার মাথায়–পাটাতনের দু'প্রান্তের সাথে পেরেক দিয়ে আটকে দিলাম কাপড়টার ঝুলে থাকা দু'পাশ। আপাতত দুটো দেয়ালের কাজ করবে এই দুই পাশ, মোটা গাছের কাণ্ডটা তৃতীয় দেয়াল। সামনের দিকটা ফাঁকাই রইলো–গাছের ওপর থেকে সাগরের চমৎকার রূপ দেখতে পারবো যখন তখন।

শেষ কাজ ক'টা বেশ দ্রুত শেষ করা গেল। যখন আমি আর ফ্রিৎস গাছ থেকে নেমে এলাম তখনও দিন শেষ হতে বেশ বাকি। গাছের গোড়ায় তখনও বেশ কিছু ছোট ছোট কাঠ রয়ে গেছে। দিনের এই সময়টুকুই বা নষ্ট করবো কেন? আবার বসে গেলাম কাজে। সাদাসিধে ধরনের একটা টেবিল আর গোটা কয়েক বেঞ্চ তৈরি করে পেতে দিলাম গাছের গোড়ায় শিকড়গুলোর মাঝখানে। তৈরি হয়ে গেল আমাদের খাবার ঘর। তারপরই সটান শুয়ে পড়লাম মাটিতে। সারাদিনের প্রচণ্ড পরিশ্রমে রীতিমতো বিধ্বস্ত অবস্থা আমার আর ফ্রিৎস-এর। উদ্বিগ্ন মুখে এগিয়ে এলো এলিজাবেথ।

'কাল আর কোনো কাজ করতে পারবো না,' বললাম আমি। 'প্রাচীনকালে ক্রীতদাসদের যেমন খাটানো হতো ঠিক তেমন খাটুনি গেছে আজ।'

'কাজ করতে চাইলেও কাল কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না তোমাকে,' জবাব দিলো সে। 'আমি হিসেব করে দেখেছি, কাল হলো রবিবার–প্রার্থনা আর ছুটির দিন। কাল আমরা সবাই প্রার্থনা করবো আর বিশ্রাম নেবো।'

'সত্যি নাকি?' উঠে বসলাম আমি। যে দিন আমরা ভেঙে পড়া জাহাজে পরিত্যক্ত হই সেদিন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত হিসেব করে দেখলাম। আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না, মাঝখানে আরো একটা রবিবার যে কোনদিক দিয়ে পার হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি কেউ।

সন্ধ্যার আর বেশি বাকি নেই। আমাদের নতুন টেবিলে রাতের খাবার পরিবেশন করলো এলিজাবেথ–কাল ফ্রিৎস যে ফ্ল্যামিঙ্গোটা মেরেছে তার মাংস, ছাগলের দুধ আর বিস্কুট। পোষা জন্তু-জানোয়ারগুলোকে খেতে দিলাম আগে। তারপর খেতে বসলাম নিজেরা। ছোট বানর ছানাটাও বসলো আমাদের সাথে। লাফিয়ে লাফিয়ে একবার ফ্রিৎস-এর কাঁধে–একবার আর্নেস্টের কাঁধে উঠতে লাগলো সে। ওরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু খাবার দিয়ে তৃপ্ত করলো তাকে।

'মাখন আর পনির বানানোর মতো কিছু পাত্র তৈরি করতে হবে,' খেতে খেতে বললো এলিজাবেথ। 'আজ যেটুকু দুধ পেয়েছি তার অর্ধেকেই আমাদের খাওয়া হয়ে যাবে। বাকিটুকু কি নষ্ট করবো?'

'নিশ্চয়ই না,' জবাব দিলাম আমি। 'তাহলে তো খুব শিগগিরই আরেকবার জাহাজে যেতে হয়। তোমার মাখন বানানোর পাত্র ছাড়াও কিছু দরকারী জিনিস নিয়ে আসা যাবে। হাঁস-মুরগিগুলোর জন্যে কিছু শস্যদানাও আনা দরকার।'

'আবার সেই জাহাজে যাওয়ার কথা!' চোখ মুখ কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করলো আমার স্ত্রী। 'যতক্ষণ না ওটা পানির তলে যাচ্ছে ততক্ষণ আর শান্তি নেই আমার! আর কতবার বলবো, তোমরা ওখানে গেলে সারাদিন আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি!'

'বুঝলাম তোমার কথা। কিন্তু এছাড়া উপায় আছে কোনো? প্রতিদিনই দেখবে একটা না একটা নতুন জিনিস দরকার পড়ছে। জাহাজ থেকে না আনলে কোথায় পাবে ওসব? ঘরের কাছে বাজার তো নেই যে কিনে আনলেই হবে! তাই তো বার বার যেতে হয়। তলিয়ে যাওয়ার আগেই যত বেশি সম্ভব জিনিস নিয়ে আসতে হবে ওখান থেকে। তোমাকে কথা দিচ্ছি, যেদিন আবহাওয়া এক্কেবারে পরিষ্কার দেখবো সেদিনই শুধু যাবো।'

খাওয়া দাওয়া শেষ করে গাছের গোড়ায় একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বাললো ছেলেরা। শুকনো ডাল-পালা দিনের বেলায়ই স্তূপ করে রেখেছিলো, এখন আগুন ধরিয়ে দিলো শুধু। তারপর এক এক করে গাছের ওপর ঘরে উঠে গেলাম আমরা। ফ্রিৎস উঠলো প্রথমে। তারপর একে একে আর্নেস্ট, জ্যাক, এলিজাবেথ, সবশেষে ফ্রান্সিসকে পিঠে নিয়ে আমি। ওঠার আগে মইয়ের গোড়াটা ঢিলে করে দিলাম, যাতে ওপরে উঠে তুলে নিতে পারি ওটা। ফলে ফ্রান্সিসকে পিঠে নিয়ে উঠতে বেশ কষ্ট হলো আমার। দুলছে মইটা।

অবশেষে ওপরে পৌঁছুলাম আমি। মইটা টেনে তুললাম। ইতিমধ্যে সবাই যার যার দোলনায় উঠে পড়েছে। আমিও আর অপেক্ষা করলাম না। দ্বীপে ওঠার পর এই প্রথম নিশ্চিন্ত মনে, পরিপূর্ণ প্রশান্তির সাথে ঘুমালাম আমি।

BanglaBook.org

বারো

পরদিন রোববার। ছুটির দিন।

দেশে থাকলে যেমন কাটাতাম তেমনি দিনটা কাটিয়ে দিলাম প্রার্থনা, গল্পগুজব আর বিশ্রাম করে। দুপুরের খাওয়া শেষ করে গাছের ছায়ায় গোল হয়ে বসলাম আমরা ছ'জন।

'এবার আমাদের নতুন বাসস্থানের নামকরণ করতে পারি আমরা কি বলো?' আমি বললাম। 'দ্বীপের অন্যান্য অংশেরও নাম ঠিক করা উচিত, তাই না?'

'খুব ভালো হয়!' এক সাথে চিৎকার করে উঠলো ছেলেরা।

'জ্যাক বললো, 'আমরা খুব কঠিন কঠিন নাম ঠিক করবো, বাবা, যেন বলতে গিয়ে জিভ বেরিয়ে যায় সবার। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার নাম উচ্চারণ করতে কি দশা হয় আমাদের, একবার ভাবো! রবিনসন ক্রুসের মতো আমাদের কাহিনী একদিন লেখা হবে, তখন যারা পড়বে সবার যেন আমার মতো অবস্থা হয়। *মোনো মোটাপা জাঙ্গ য়েরার, করো মানডেল*—আর নাম পায়নি ব্যাটারা।'

হেসে ফেললাম আমি। 'তোমার কাহিনী যারা পড়বে তাদের কথা জানি না,

আপাতত ঐ শক্ত নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে যদি কারো জিভ বের হয় তো সে আমাদের। বাতিল করে দেয়া হচ্ছে জ্যাকের পরিকল্পনা। রাজি সবাই?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ রাজি।'

'সুন্দর নাম আমরা পাচ্ছি কোথায়?' হতাশ মুখে বললো জ্যাক।

'ভাবো। ভাবলেই পেয়ে যাবে। আমাদের নিজের ভাষা থেকে সুন্দর সুন্দর শব্দ বেছে নেবো নাম হিসেবে। প্রথমে নাম দেবো, যেখান দিয়ে নেমেছি এদ্বীপে সেই খাঁড়িটার। ফ্রিৎস, তুমি বলো প্রথমে।'

'ওটার নাম দিতে পারি *অয়েস্টার বে*,' বললো ফ্রিৎস। 'কি বিপুল পরিমাণ ঝিনুক আমরা দেখেছি ওখানে মনে আছে?'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো জ্যাক। 'তার চেয়ে *লবস্টার বে* আরো ভালো। বিরাট এক গলদা চিংড়ি ওখানে আমার পা কামড়ে ধরেছিলো।'

'ভালো কথা,' বললো আর্নেস্ট, 'চিংড়ি তোমার পা কামড়ে ধরার পর তুমি কেঁদে ফেলেছিলে তাই ওটার নাম হতে পারে *বে অফ টিয়ারস*।'

'আমার পরামর্শ হলো,' এবার কথা বললো এলিজাবেথ, 'খাঁড়িটার নাম তোমরা দিতে পারো *প্রোভিডেন্স বে* অথবা *বে অফ সেফটি*।'

'ঠিক,' বললাম আমি, 'সেফটি বে-ই সবচেয়ে ভালো নাম। কারণ ওই খাঁড়ির মাধ্যমেই আমরা নিরাপদে আশ্রয় পেয়েছি এ দ্বীপে।'

খুশি মনে রাজি হলো সবাই।

এবার আমি বললাম, 'যেখানে আমরা প্রথম তাঁবু খাটিয়েছিলাম সে জায়গার নাম কি দেয়া যায়?'

'*টেন্ট হাউস*,' বললো ফ্রিৎস।

'হ্যাঁ, নামটা সুন্দর,' আমি বললাম। 'সেফটি বে-তে ঢোকার মুখে যে ছোট পাহাড়ী দ্বীপটা, ওটার নাম দাও এবার।'

'ওটার নাম হতে পারে,' আর্নেস্ট বললো, '*সী গাল আইল্যাণ্ড* বা *শার্ক আইল্যাণ্ড*।'

'পরেরটাই পছন্দ আমার,' বললাম আমি, '*শার্ক আইল্যাণ্ড*। ফ্রিৎস-এর সাহস আর সাফল্যের স্মারক হয়ে থাকবে নামটা।'

'একই কারণে,' বললো জ্যাক, 'যে জলাভূমি থেকে আমরা বাঁশ কেটেছিলাম সেটার নাম দিতে পারি *ফ্ল্যামিঙ্গো মার্শ*।'

'ঠিক ঠিক,' বললাম আমি। 'যে মাঠের ভেতর দিয়ে আমরা এখানে এসেছি সেটার নাম তাহলে হোক *পর্কুপাইন ফিল্ড*। এবার আসছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নামটা—আমাদের এখানকার বাসস্থানের নাম কি দেবো আমরা?'

আর্নেস্ট বললো, 'ট্রি ক্যাসল।'

'না না,' আপত্তি করলো ফ্রিৎস, 'শুধু ওতে চলবে না। একটা শহরের নামকরণের মতো ব্যাপার এটা। খুব ভালো নাম হতে হবে।'

'তাহলে *ফিগ টাউন* হতে পারে,' মত দিলো জ্যাক।

'হা, হা, হা, খুব ভালো একটা নাম পছন্দ করেছে জ্যাক,' বললো ফ্রিৎস। কয়েক মুহূর্ত ভাবলো ও। 'তারপর যোগ করলো, '*ঈগ্‌লস নেস্ট* হতে পারে।

BanglaBook.org

পথর বা প্রাসাদের চেয়ে পাখির নীড়ের সঙ্গেই সাদৃশ্য বেশি আমাদের বাসাটার। ফাল্ক হলো পাখিদের রাজা, আমরাও এখানকার রাজার মতো।'

'এখনো রাজা হইনি আমরা,' বললাম আমি। 'আমার মনে হয় আমাদের নতুন বাসার নাম দেয়া যেতে পারে *ফ্যালকন'স নেস্ট*। তোমরা বাজ পাখি অর্থাৎ ফ্যালকনের মতোই বিশ্বস্ত, কর্মঠ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন এবং সাহসী।'

'ঠিক! ঠিক!' ছেলেরা সবাই এক সাথে চেঁচিয়ে উঠলো। 'আমরা এটাকে *ফ্যালকন'স নেস্ট* বলেই ডাকবো।'

'আচ্ছা এবার বলো, আমি আর ফ্রিৎস যেখানে আমাদের জাহাজী সঙ্গীদের খুঁজে হয়রান হয়েছি কিন্তু পাইনি, সেই অন্তরীপটার নাম কি রাখবো? *কেপ ডিসএপয়েন্টমেন্ট* পছন্দ হয় তোমাদের?'

'হ্যাঁ, চমৎকার! যে নদীর ওপর আমরা পুল তৈরি করলাম সেটার নাম?'

'এদ্বীপে ওঠার পর আমাদের সবচেয়ে স্মরণীয় যে স্মৃতি তাকে আমরা অমর করে রাখতে পারি নদীটার নাম *জ্যাকল রিভার* দিয়ে। আর পুলটার নাম *ফ্যামিলি ব্রিজ*।'

'ওহ কি সুন্দর নাম!'

'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে সত্যিই আমরা এ দ্বীপের রাজা,' গম্ভীর মুখে বললো ফ্রান্সিস।

'উঁহুঁ,' হেসে বললো ওর মা, 'তোমরা হচ্ছো রাজপুত্র আর আমি রানী। রানী আশা করে তোমরা সব সময় তোমাদের প্রজাদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। এ দ্বীপে যত জীব-জন্তু, পশু-পাখি আছে সব তোমাদের প্রজা। ওদের যত্ন নেয়া তোমাদের কর্তব্য। কারণে-অকারণে দেখামাত্র কোনো প্রাণীকে গুলি করে মারা ঠিক না। মনে রাখবে, তোমাদের মতো ওদেরও একমাত্র আশ্রয় এদ্বীপ।'

'না, মা, আর কখনো ওরকম করবো না,' অপরাধী গলায় বললো ফ্রিৎস। 'যেগুলো বিপজ্জনক আর যেগুলো থেকে খাবার পাওয়া যাবে সে-সব ছাড়া আর কোনো পশুপাখি কখনো মারবো না।'

এই রকম গল্প-গুজব, কথাবার্তার ভেতর দিয়ে কখন যে রোববারটা পেরিয়ে গেল টেরই পেলাম না। পরদিন সোমবার, আবার কাজ শুরু হলো আমাদের। সকালে নাশতা করেই বসতে হলো ছেলেদের জন্যে তীর ধনুক বানানোর কাজে। একমাত্র ফ্রিৎস ছাড়া বাকি তিন জনই ধরেছে, ওদেরকে তীর ধনুক বানিয়ে দিতে হবে ওদের। বাঁশ চিরে চটা তৈরি করলাম। সেই চটা দিয়ে হলো ধনুক আমার স্ত্রীর পেটমোটা ঝোলা থেকে-শক্ত মোটা সুতো দিয়ে হলো ছিলা। তীর-ও হলো বাঁশের চটা দিয়ে।

খুশি মনেই আমি বানিয়ে দিলাম ওগুলো। কারণ, জানি, একদিন না একদিন বারুদ গুলির ভাণ্ডার ফুরোবে, তখন এই তীর ধনুকই হবে আমাদের আসল হাতিয়ার। সুতরাং এখন থেকেই যদি ছেলেরা তীর ধনুকে হাত পাকিয়ে রাখে তাহলে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

তীর ধনুক বানাতে বানাতে দুপুরে খাওয়ার সময় হয়ে গেল। খেয়েদেয়ে গাছের ছায়ায় বসলাম আমরা।

BanglaBook.org

'আজ আর কোনো কাজ নয়,' বললাম আমি। 'বেলা একটু পড়ুক, কোথাও থেকে ঘুরে আসবো। কোথায় যাওয়া যায় বলো দেখি?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো ফ্রিৎস। 'টেন্ট হাউসে, বাবা। গুলি বারুদ প্রায় শেষ আমাদের।'

'আমিও টেন্ট হাউসের পক্ষে,' বললো এলিজাবেথ। 'মাখন প্রায় শেষ, আরো খানিকটা না নিয়ে এলে খাবারের স্বাদ কিন্তু খারাপ হবে। পারলে হাঁসগুলো-ও নিয়ে আসতে চাই।'

'তাহলে চলো টেন্ট হাউসে।'

অল্প সময়ে তৈরি হয়ে নিয়ে রওনা হলাম আমরা। ফ্রিৎস, আর্নেস্ট আর আমার কাঁধে বন্দুক। জ্যাকের কোমরে পিস্তল, কাঁধে ধনুক, পিঠে তূনীর ভর্তি তীর। পিচ্চি ফ্রান্সিসও কাঁধে ঝুলিয়েছে ধনুক। একটা করে ঝোলা রয়েছে প্রত্যেকের কাঁধে। এলিজাবেথের কাছেই কেবল কোনো অস্ত্র নেই, মাখনের খালি পাত্রটা নিয়েছে ও। ছোট্ট বানর-ছানাটাকে কিছু বলতে হয়নি, আমাদের রওনা হতে দেখেই সে লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে টার্ক-এর পিঠে—ইতিমধ্যে খুব ভাব হয়ে গেছে ওদের।

ঠিক করেছি, এবার পুল পেরিয়ে যাবো না। একটু ঘুর পথ হলেও পাহাড় থেকে যেখানে জলপ্রপাত নদীতে পড়েছে যাবো সেখান দিয়ে। আমার আশা, পথে হয়তো নতুন কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস পেয়ে যাবো।

আমি, ফ্রান্সিস আর ওর মা এগিয়ে চলেছি নদীর কিনার দিয়ে, বড় তিন ছেলে হৈ-হৈ করতে করতে ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দিকে।

জলপ্রপাতের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছি, হঠাৎ চিৎকার করতে করতে ছুটে এলো ফ্রিৎস, আর্নেস্ট আর জ্যাক; হাতে ছোট ছোট কয়েকটা গাছ। সেগুলোর গোড়ায় গোল গোল শিকড়। উত্তেজনায় টগবগ করছে তিন জনই।

'বাবা, মা, দেখ আমরা কি পেয়েছি! আলু! ঐ দিকে, ঐ ঝোপের কাছে!'

'কি বললে, আলু? অসম্ভব! দেখি দেখি!'

'না, বাবা, সত্যি,' বললো ফ্রিৎস, 'আমার মনে হয় এগুলো আলুই।'

হ্যাঁ, আলুর মতোই লাগছে বটে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় পেয়েছো?'

'ঐ তো ওখানে, বিরাট জায়গা নিয়ে জন্মেছে!'

'চলো দেখি।'

ছেলেরা আমাকে নিয়ে গেল সেখানে। সত্যিই তাই, বিরাট একখণ্ড জমিতে অসংখ্য আলু গাছ। বেশির ভাগ গাছেই ফুল ধরেছে। একটা গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়তে শুরু করলো ছেলেরা। বানরের বাচ্চাটাও উৎসাহের সাথে গিয়ে হাত লাগালো ওদের সাথে। অল্প সময়েই আলুর ছোটখাটো একটা স্তূপ তৈরি হয়ে গেল। আলুগুলো ঝোলায় ভরে আবার রওনা হলাম আমরা।

বিরাট একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল আমাদের। খাবারের জন্যে আর অত না ভাবলেও চলবে।

নদী পার হওয়ার আগেই আরো একটা অভাবনীয় আবিষ্কার করলাম আমরা। আনারস। ছেলেদের খুশি আর দেখে কে! পারলে তখুনি বসে যায় খেতে। আমি

BanglaBook.org

বাধা দিলাম। কয়েকটা আনারস কেটে একটা দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে বললাম, 'বাসায় গিয়ে খেও।'

নদী পার হলাম এরপর। একটু পরেই পৌঁছে গেলাম টেন্ট হাউসে। সেখানে যেমন রেখে গিয়েছিলাম ঠিক তেমন রয়েছে সব। যার যা নেওয়ার সংগ্রহ করতে লেগে গেল সবাই। বারুদ আর গুলির পিপে নিয়ে পড়লো ফ্রিৎস। ওর মা মাখনের পিপে থেকে খানিকটা উঠিয়ে ভরে নিলো নিজের পাত্রটা। আর্নেস্ট আর জ্যাক ছুটোছুটি করে ধরে ফেললো হাঁসগুলো। আমি একটা ঝোলায় কিছুটা লবণ নিয়ে নিলাম। তারপর আবার বাড়ির পথে রওনা হলাম আমরা।

তেরো

বেশ আরামেই আছি আমরা গেছো বাড়িতে। সকালে ঘুম থেকে জেগে নিচে নেমে আসি, তারপর শুরু হয় কাজ। ছেলেদের দু'এক জন চলে যায় বন্দুক কাঁধে নিয়ে। যখন ফিরে আসে তখন কিছু না কিছু থাকেই সঙ্গে–হয় পাখি নয়তো খাওয়ার উপযোগী ছোট কোনো প্রাণী। একদিন একটা খরগোশ শিকার করে আনলো ফ্রিৎস। বেশ একটা উপাদেয় ভোজ হলো সেদিন।

গাছের নিচটা ইতিমধ্যে বেশ বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। লম্বা লম্বা ঘাস ছেঁটে, ঝোপ ঝাড় কেটে, পরিষ্কার করে ফেলেছি চারপাশ। মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনতে হয় টেন্ট হাউস থেকে। সেজন্যে একটা স্লেজ তৈরি করে নিয়েছি। গাধাটাকে জুড়ে দিই, ও টেনে নিয়ে আসে স্লেজটা। মালপত্র বইবার জন্যে কষ্ট প্রায় করতেই হয় না এখন। কিছু দিনের ভেতর একান্ত প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিসই আনা হয়ে গেল টেন্ট হাউস থেকে। আরেকবার বিধ্বস্ত জাহাজটায় যাওয়ার কথা ভাবলাম এবার।

যথারীতি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বেঁকে বসলো আমার স্ত্রী।

'আবার সেই জাহাজে যাওয়ার কথা!' বললো ও। 'দরকারী সব জিনিসই তো আমাদের আছে, তবু কেন আবার যাবে ওখানে?'

শুরু হলো বিতর্ক। এক এক করে নানা যুক্তিজাল বিস্তার করে ওকে বোঝালাম, কেন ওখানে যাওয়া দরকার।

'শোনো,' বললাম আমি, 'আপাতত মনে হচ্ছে সব জিনিসই আছে আমাদের, কিন্তু কয়েকদিন পরেই হয়তো এমন কিছু একটা দরকার পড়বে যা আমাদের কাছে নেই, অথচ জাহাজে আছে। অনেক অস্ত্রপাতি আছে জাহাজে। আমি জানি, একদিন না একদিন ওগুলো আমাদের কাজে লাগবেই। কাপড়চোপড়ের কথা ধরো, এখন যা আছে তাতে ক'বছর চলবে? কিন্তু জাহাজে আছে অনেক–নাবিকরা যখন নেমে যায় তখন কাপড়চোপড় নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবারও সময় পায়নি। ওগুলো নিয়ে আসতে পারলে পাঁচ-সাত বছরের জন্যে নিশ্চিন্ত আমরা।'

এই ধরনের আরো নানা যুক্তি খাড়া করলাম। অবশেষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি

BanglaBook.org

হলো এলিজাবেথ।

পরদিন ভোরে নাশতা সেরেই ফ্রিৎসকে পাঠিয়ে দিলাম টেন্ট হাউসে। বললাম, 'তুমি যাও, নৌকাটাকে যাত্রার জন্যে তৈরি করতে লাগো, আমি আসছি।'

দু'মিনিট পর এলিজাবেথ এবং ছেলেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম আমি। যাওয়ার আগে বলে গেলাম, 'দিনে দিনে হয়তো নাও ফিরতে পারি। আমাদের জন্যে বসে না থেকে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পোড়ো তোমরা। আর, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, ঝড় বাদল যদি না আসে, আমরা ঠিকই থাকবো।'

টেন্ট হাউসের কাছে নৌকায় চাপলাম আমি আর ফ্রিৎস। কিছুক্ষণের মধ্যে পেরিয়ে গেলাম সেফটি বে। তারপর স্রোতের টানে শার্ক আইল্যাণ্ডের পাশ কাটিয়ে বিধ্বস্ত জাহাজে। এখনো দুই ডুবো পাহাড়ের মাঝখানে তেমনি আটকে আছে জাহাজটা। তবে ভাব দেখে মনে হলো পুরোপুরি ভেঙে পড়তে খুব একটা বাকি নেই। জাহাজের গায়ে নৌকাটাকে ভালো করে বেঁধে উঠে পড়লাম ডেকে।

প্রথমেই বড়সড় মজবুত একটা ভেলা তৈরি করলাম। বুদ্ধিটা আর্নেস্টের। গত রাতে ওর মার সঙ্গে যখন জাহাজে আসার ব্যাপারে আলাপ করছিলাম তখনই বুদ্ধিটা দেয় ও। গামলা জোড়া দিয়ে বানানো নৌকায় একবারে বেশি জিনিস নেয়া যায় না বলে বুদ্ধিটা পছন্দ হয়েছে আমার।

সামান্য খোঁজাখুঁজি করতেই ডেকের এক পাশে দড়িদড়ার স্তূপের নিচে পেয়ে গেলাম বেশ কয়েকটা পানির পিপে। বিরাট একেকটা। সব কটা পিপে খালি করে ভালো মতো মুখ আটকে দিলাম। ফ্রিৎস আর আমি সেসব গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে গেলাম ডেকের কিনারে। লম্বা একটা দড়ি দিয়ে সবগুলো বেঁধে নামিয়ে দিলাম পানিতে। জাহাজের গায়ে লেগে থেকে দিব্বি ভাসতে লাগলো বিরাট পিপেগুলো। দড়ি বাঁধা থাকায় ভেসে যেতে পারলো না।

এরপর শুরু হলো ভেলা বানানোর দ্বিতীয় পর্যায়। শক্ত মোটা কয়েকটা কাঠের বাতা পেরেক দিয়ে আটকে দিলাম পিপেগুলোর ওপরে। একটু পরেই ভাসমান একটা চারকোনা কাঠামো তৈরি হলো। কাঠামোর লম্বা দু'দিকে পিপের সংখ্যা চারটে করে, বাকি দু'দিকে তিনটে করে। অর্থাৎ মোট দশটা পিপে ব্যবহার করছি আমরা। এরপর কাঠামোটার ওপর তক্তা বিছিয়ে আটকে দিলাম পেরেক মেরে। তৈরি হয়ে গেল ভেলার পাটাতন।

বেশ পরিশ্রম হলো কাজটা শেষ করতে। সময়ও লাগলো অনেক। কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে টের পাইনি। আজ আর ফেরা হচ্ছে না। সঙ্গে আনা নুন দিয়ে রাখা ঠাণ্ডা সেদ্ধ মাংস খেয়ে ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঢুকে শুয়ে পড়লাম আমি আর ফ্রিৎস।

পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই ঘুম থেকে উঠে লেগে গেলাম ভেলা বোঝাই দেয়ার কাজে। প্রথমেই ধরলাম জাহাজে আমরা যে কেবিনটায় ছিলাম সেটা। জানালা দরজা থেকে শুরু করে যা যা পেলাম সব নিয়ে ওঠালাম ভেলায়। আমাদের যেসব বাক্স-পেঁটরায় কম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছিলো সেগুলো রেখে গিয়েছিলাম আগেরবার। প্রথমেই সেগুলো তুললাম ভেলায়। তারপর জাহাজে কর্মকর্তাদের মূল্যবান জিসিনপত্রে ঠাসা কয়েকটা সিন্দুক; ছুতোর মিস্ত্রীর ঘরে যা

যা পেলাম–যন্ত্রপাতির অবশিষ্ট অংশ, পেরেক, কাঠ, লোহালক্কড় সব। জাহাজে চড়ে আমরা যাচ্ছিলাম অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানকার খামার মালিকদের প্রয়োজনীয় নানা জিনিস বহন করছিলো জাহাজটা। সেসব জিনিসের ভেতর যেগুলো বেশি জরুরি সেগুলোর একটা তালিকা তৈরি করলাম আমি আর ফ্রিৎস। তারপর এক এক করে তুললাম ভেলায়।

সেগুলোর ভেতর রয়েছে, বেশ কিছু চমৎকার লোহার দণ্ড, কয়েক তাল সীসা, ছুরি শানানোর পাথর, তৈরি অবস্থায় কয়েকটা পশু টানা গাড়ির চাকা, পশু চিকিৎসকের যন্ত্রপাতি এক বাক্স; চিমটা, বেলচা, লাঙলের ফলা, লোহা এবং তামার তারের কুণ্ডলী; বেশ কয়েক বস্তা ভুট্টা, মটর, ওট, কলাই-এর বীজ; একটা হাতে চালানোর যাঁতা, এমন কি ছোট ছোট পাত্রে বেশ কিছু ফলের চারাও।

বড় একটা সিন্দুক ভর্তি লুইদোর আর ডলার পেলাম। বেশ খুশি হয়ে উঠলাম আমি। ভাবলাম দরকারী কোনো জিনিস নামিয়ে রেখে হলেও স্বর্ণমুদ্রাগুলো এবারেই নিয়ে যাওয়া উচিত আমাদের, পরের বার আসতে আসতে জাহাজটা পুরোপুরি ভেঙে তলিয়ে যেতে পারে সাগরে। কিন্তু বাধা দিলো ফ্রিৎস।

'ওগুলো কি কাজে আসবে আমাদের?' বললো ও। 'তার চেয়ে এই লোহা আর সীসাগুলো নেয়া অনেক বেশি জরুরি।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো, ফ্রিৎস। এ টাকা এখন কি কাজে আসবে? তার চেয়ে এই লোহার টুকরোগুলো অনেক দরকারী আমাদের কাছে। তোমার কথাই থাক, আগে এগুলোই নেবো, পরে যদি আবার আসি তখন ভেবে দেখবো টাকাগুলোর কথা।'

বোঝাই দেয়া হয়ে গেছে ভেলা। নৌকাটাও। আমি আর ফ্রিৎস উঠে পড়লেই হয়। শেষবারের মতো একবার চক্কর দিলাম পুরো জাহাজে–হাল্কা অথচ খুব দরকারী কিছু পাওয়া যায় কিনা। হ্যাঁ, পেয়ে গেলাম তেমন কয়েকটা জিনিস। একটা চমৎকার মাছ ধরার জাল, একেবারে নতুন; জাহাজের বড় কম্পাসটা, ফ্রিৎস পেলো গোটা দুই হারপুন আর একটা হালকা চরকিকল। হারপুন দুটোর সাথে লাগানো দড়ি প্যাঁচানো রয়েছে চরকিকলে।

ইতিমধ্যে দুপুর পেরিয়ে গেছে। নৌকায় উঠে পাল তুলে দিলাম আমি আর ফ্রিৎস। এবার আর তরতর করে এগোলো না নৌকা, ভারি ভেলাটা বাঁধা রয়েছে পেছনে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম তীরের দিকে।

কয়েকদিন পর আবার এলাম জাহাজে। আগের মতোই নৌকায় চড়ে এলাম আমরা, পেছনে দড়ি বেঁধে নিয়ে এলাম ভেলাটাকে। যেসব জিনিস রয়ে গিয়েছিলো সেগুলো বোঝাই দিয়ে রওনা হওয়ার ঠিক আগে অভাবনীয় একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম আমি–ছোটখাটো জাহাজের আকৃতির বিরাট এক পানসি নৌকার খণ্ড খণ্ড অংশ। খণ্ডগুলো এক সাথে জুড়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে নৌকা। কোন্ খণ্ডের সঙ্গে কোন্ খণ্ড জুড়তে হবে তা দেখানো আছে নম্বর দিয়ে। নম্বর মিলিয়ে খণ্ডগুলো জুড়তে হবে। কাজটা খুব সোজা হবে না, সময় লাগবে অনেক, পরিশ্রমও হবে বেশ। হোক পরিশ্রম, ভাবলাম আমি, সময়ের কোনো অভাব নেই

BanglaBook.org

আমাদের–শুধু দু'এক দিনের ভেতর ঝড় ঝঞ্ঝা না উঠলেই হয়। পর পর কয়েক দিন আসতে হবে জাহাজে এই যা।

ফ্রিৎসকে বললাম, 'পানসিটার কথা তোমার মাকে বোলো না। কয়েকবারে এসে আমরা জুড়ে ফেলবো ওটা, তারপর পাল তুলে তীরে যাবো। চমকে দেবো ওকে।'

'ওহ, খুব মজা হবে, বাবা!' বললো ফ্রিৎস। 'কিন্তু শুধু আমরা দু'জনে কাজ করলে অনেক সময় লেগে যাবে। এর পর থেকে আর্নেস্ট আর জ্যাককেও নিয়ে আসলে হয় না? ওদেরও মানা করে দেবো, মাকে যেন কিছু না বলে।'

'হ্যাঁ, বুদ্ধিটা খারাপ নয়। তবে তোমার মা যদি ছাড়তে রাজি হয় তবেই আনা যাবে ওদের। দেখি, ভুলিয়ে ভালিয়ে ওকে রাজি করা যায় কিনা।'

তীরের দিকে রওনা হলাম আমরা। সাগর শান্ত। ভরা পালে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে আমাদের নৌকা আর তার পেছনে বাঁধা ভেলা। টুকটাক আলাপ করছি আমি আর ফ্রিৎস। সামনের দিকে আমার চোখ।

হঠাৎ খেয়াল করলাম ফ্রিৎস-এর কোনো সাড়া শব্দ নেই, আমি একাই কেবল কথা বলে চলেছি। পেছন ফিরতেই দেখি পাশে কি একটার দিকে যেন তাকিয়ে আছে ও। একটা হারপুন তুলে নিয়ে তাক করছে জিনিসটার দিকে।

ভালো করে তাকাতেই আমি চিনতে পারলাম ওটা–বিশাল এক কচ্ছপ। নৌকা থেকে গজ বিশেক দূর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। তার বাঁকানো পিঠের প্রায় সবটাই উঠে আছে পানির ওপর।

দু'সেকেণ্ড এক মনে লক্ষ্য স্থির করলো ফ্রিৎস। তারপর সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে দিলো হারপুন। ঠক করে একটা শব্দ হলো কচ্ছপের খোলা ছিদ্র হওয়ার। হারপুনটার প্রায় আধাআধি গেঁথে গেছে কচ্ছপের পিঠে। সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিলো কচ্ছপ। কিন্তু কোথায় যাবে? দড়ি বাঁধা রয়েছে হারপুনের সঙ্গে। দড়িতে টান পড়তেই আবার ভেসে উঠতে হলো তাকে। ভেলার সঙ্গে কচ্ছপটাকেও আমরা টেনে নিয়ে চললাম নৌকার পেছন পেছন।

ডাঙায় নেমে প্রথমেই কচ্ছপটাকে মারলাম। টানা হ্যাঁচড়া করে তার খোলাটা খসালাম। চওড়ায় সেটা ছ'ফুটের ওপর।

'আমাদের এক সপ্তাহের মাংসের চাহিদা মিটবে,' বললো ফ্রিৎস।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম আমি।

এরপর ভেলা আর নৌকা থেকে জিনিসপত্র নামানো হলো। রোদ-বাদলে নষ্ট হওয়ার মতো জিনিসগুলো তাঁবুর ভেতর নিয়ে রাখলাম, বাকিগুলো রইলো খোলা আকাশে নিচে। আমি কচ্ছপের মাংস একটা থলেয় ভরে কাঁধে তুলে নিলাম, খোলাটা মাথায় নিলো ফ্রিৎস। রওনা হলাম ফ্যালকন'স নেস্ট-এর পথে।

কচ্ছপের বিরাট খোলাটা দেখে হৈ-চৈ করে উঠলো আর্নেস্ট, জ্যাক আর ফ্রান্সিস। ওদের মা-রও চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

'আর্নেস্ট, এটা যদি তোমাকে দিয়ে দেয়া হয় তাহলে কি করবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ঢাল বানাবো,' জবাব দিলো ও। 'রবিনসন ক্রুসোর দ্বীপে যেমন জংলীরা

BanglaBook.org

এসেছিলো তেমন যদি আমাদের দ্বীপেও আসে তাহলে এই ঢাল দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারবো।'

'আর তোমাকে দিলে, জ্যাক?'

'কিছু একটা দিয়ে খোলার ফুটোটা বন্ধ করে নৌকা বানাবো। নদীতে সুন্দর বেয়ে বেড়াতে পারবো।'

'ছোট একটা ঘর বানাবো আমি,' কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলে উঠলো ফ্রান্সিস। 'এটা দিয়ে ছাদ দেবো। এটা আমাকে দাও, বাবা।'

'না না, আমাকে, আমাকে!' এক সাথে বললো আর্নেস্ট আর জ্যাক।

একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম, 'ফ্রিৎস মেরেছে কচ্ছপটা, সুতরাং খোলাটা ওর-ই প্রাপ্য।' ফ্রিৎস-এর দিকে ফিরলাম, 'কি করবে তুমি এটা দিয়ে?'

'ফুটোটা বন্ধ করে নদীর তীরে বসিয়ে দেবো। প্রতিদিন একবার করে পরিষ্কার পানি ভরে দিয়ে আসবো। রান্না বা ধোয়া-ধুয়ির কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে মা-র জন্যে।'

'হুঁ, ভালো কথা ভেবেছো তুমি।' আর্নেস্ট, জ্যাক আর ফ্রান্সিসের দিকে তাকালাম, 'তোমরা শুধু নিজেদের কথাই চিন্তা করেছো। কিন্তু দেখ, তোমাদের বড় ভাই ভেবেছে মায়ের কথা; কি করলে মায়ের একটু কষ্ট কমে সে কথা। আশা করি তোমরাও ভবিষ্যতে এমন শুধু নিজের কথা নয়, পরিবারের সবার কথা ভাববে।'

পরদিন সকালে আবার ভাঙা জাহাজটায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হলাম আমি আর ফ্রিৎস। আজ থেকেই শুরু হবে পানসি নৌকার অংশগুলো জোড়া লাগানোর কাজ। ফ্রিৎস-এর পরামর্শের কথা মনে পড়লো—আর্নেস্ট আর জ্যাককেও নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। তাতে বেশ সহজ হয়ে যাবে আমাদের কাজ। সবচেয়ে বড় কথা, সময় বাঁচবে অনেক। কিন্তু শুধু আমি আর ফ্রিৎস যখন যাই তখনই এলিজাবেথের মুখ কেমন পাংশু হয়ে যায় তা তো দেখেছি। আজ আরো দুটো ছেলেকে নিয়ে যেতে চাইলে কি করবে?

ভয়ে ভয়ে আমি কথাটা তুললাম। শেষে যোগ করলাম, 'দেখ, আমার আর ফ্রিৎস-এর কষ্ট অনেকখানি কমে যাবে ওদের নিয়ে গেলে। জাহাজ থেকে ভারি ভারি কাঠ খসানো যে কি কষ্টের কাজ তা যদি জানতে।'

শুনে কেঁদে ফেললো এলিজাবেথ। বললো, 'এতদিন দু'জনের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছো, আজ থেকে চার জনের নেবে!'

'আচ্ছা, এর ভেতর তুমি ঝুঁকি দেখছো কোথায়? দিব্বি আমরা যাই আসি।'

'একদিন যদি ঝড় ওঠে?'

'হুট করে কি আর ঝড় ওঠে?' স্তোক দিলাম ওকে। 'আগে মেঘ সাজবে, তারপর তো ঝড়। আকাশে মেঘ দেখার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবো আমরা।'

'ঠিক আছে যাও, তবে খুব সাবধানে থাকবে,' কাঁদতে কাঁদতে বললো ও।

যাওয়ার কথা শুনে খুশিতে লাফিয়ে উঠলো জ্যাক আর আর্নেস্ট। প্রতি বার আমি আর ফ্রিৎস যখন যাই ওরা বায়না ধরে যাওয়ার জন্যে। আজ মেঘ না

BanglaBook.org

চাইতেই যখন বৃষ্টি পেলো তখন আর ওদের আনন্দ দেখে কে।

সময় নষ্ট না করে আমরা রওনা হলাম। গুলি বন্দুক ছাড়াও খাবার হিসেবে সঙ্গে নিলাম সেদ্ধ আলু। টেন্ট হাউসে পৌঁছে নৌকায় চাপলাম। ভেলাটাকেও দড়ি বেঁধে নিয়ে চললাম–ফেরার পথে তাড়াহুড়ায় যা পারি তা-ই নিয়ে আসবো।

জাহাজে পৌঁছে প্রথমেই চলে গেলাম পানসিটার কাছে। আজ সময় নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করলাম ওটা। খণ্ডগুলো পরিষ্কারভাবে নম্বর দেয়া। নম্বরে নম্বরে মিলিয়ে টুকরোগুলোর জোড়া দিলেই হয়ে যাবে, কঠিন কিছু না। তবে কাজটা সময় সাপেক্ষ। কারণ খণ্ডগুলো বেশ ভারি–খুব মজবুত কাঠ দিয়ে তৈরি। ঐ ভারি অংশগুলো বয়ে আনতে হবে এক জায়গায়, তারপর জুড়তে হবে। তাছাড়া খণ্ডগুলো রয়েছে জাহাজের মাঝ অংশে। জোড়া দেয়ার পর পানিতে ভাসাবো কি করে?

পানিতে ভাসানোর সমস্যা নিয়ে বেশি ভাবলাম না। সমস্যাটা যখন সামনে এসে দাঁড়াবে তখন দেখবো সমাধান করা যায় কি করে। আপাতত জুড়ে ফেলা যাক খণ্ডগুলো।

সারা জাহাজ জুড়ে পিঁপড়ের মতো ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে ছেলেরা, আর যেখানে যা পাচ্ছে নিয়ে তুলছে ভেলায়। ওদের ডাক দিয়ে হাতুড়ি পেরেক নিয়ে কাজ শুরু করলাম। ছেলেরা প্রাণপণ পরিশ্রম করে একটা একটা টুকরো টেনে আনছে। তারপর আরো কষ্ট করে মিলিয়ে ধরছে অন্য টুকরোর সাথে। দ্রুত হাতে পেরেক মেরে দিচ্ছি আমি।

দেখতে দেখতে কখন যে বিকেল হয়ে গেল টেরই পেলাম না আমরা। যখন খেয়াল হলো তখন আঁতকে উঠলাম। সন্ধ্যা হতে বেশি বাকি নেই, অথচ কাজ খুব একটা এগোয়নি। তবু আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করার কথা ভাবলাম না–একা রয়েছে ফ্রান্সিস আর ওর মা!

ঝটপট উঠে পড়লাম নৌকায়। বাঁধন খুলে পাল তুলে দিলাম। সন্ধ্যার একটু আগে আমরা টেন্ট হাউসে পৌঁছুলাম। ফ্যালকনস নেস্ট-এ যখন পৌঁছুলাম তখন রাত নেমে আসছে চরাচরে। জ্যাক আর আর্নেস্টকেও মানা করে দিয়েছি, পানসিটার কথা যেন না বলে মা-কে। মা-কে অবাক করে দেয়ার বুদ্ধিটা ওদেরও খুব পছন্দ হয়েছে।

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই নাশতা করে রওনা হলাম আমরা চারজন। জাহাজে পৌঁছেই লেগে গেলাম পানসির খণ্ডগুলো জোড়া দিতে। সূর্যের দিকে নজর রাখলাম আজ। বেশ বেলা থাকতে থাকতেই ফিরে এলাম বাড়িতে।

পর পর সাত দিন হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের পর তৈরি হলো পানসি নৌকা। মাস্তুলগুলোও লাগানো হয়ে গেছে। প্রতিদিনই সূর্য ওঠার আগে রওনা হয়ে এসেছি আমরা, ফিরে গেছি সন্ধ্যায়। প্রতিদিনই ভেলায় করে কিছু না কিছু জিনিস তীরে নিয়ে গেছি। ফলে পানসি নৌকাটার কাজ শেষ হতে হতে জাহাজের মূল কাঠামোটা ছাড়া আর প্রায় সব জিনিসই ডাঙায় পৌঁছে গেল।

অবশেষে মুখোমুখি হলাম সেই সমস্যার–পানসিটাকে পানিতে ভাসাবো কি করে? জাহাজের দু'পাশেই নিরেট কাঠের উঁচু রেলিং। ডুবো পাহাড়ের ফাঁকে যখন

BanglaBook.org

আটকায় তখন একদিকে কাত হয়ে ছিলো জাহাজ। এখনো আছে তেমন। যে পাশ কাত হয়ে আছে ডেকের সে প্রান্ত প্রায় পানি ছুঁয়েছে। কোনোমতে নৌকাটাকে ঠেলে ও পর্যন্ত নিতে পারলে একটা সমাধান হয়তো করা যাবে। কিন্তু তার আগে ওপাশের রেলিংটাকে খুলে ফেলতে হবে। কিন্তু রেলিংটা একবার পরীক্ষা করেই বুঝলাম কি ভয়ঙ্কর কাজ। আমরা চার বাপ ব্যাটা যদি একটানা কাজ করি তা-ও হয়তো এক মাস লেগে যাবে। ইয়া মোটা মোটা নিরেট কাঠ অত্যন্ত মজবুত করে লাগানো ভারি লোহার গজাল দিয়ে। এক মাস তো দূরের কথা, ঝড় ওঠার আগে আর দু'দিন সময় পাবো কিনা সন্দেহ। এদিককার সাগর একটানা এতদিন কখনো শান্ত থাকে বলে শুনিনি। যে কোনো দিন ঝড় উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে জাহাজটা তো যাবেই আমাদের সাধের পানসিটাও তলিয়ে যাবে সাগরে।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দিলে কেমন হয় রেলিংটা? হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে সহজ। তবে বারুদ বসানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন পানসিটার কোনো ক্ষতি না হয়।

বেশ সময় নিয়ে কায়দা করে একটা লোহার পাত্রে বারুদ নিয়ে বসালাম রেলিংয়ের গায়ে। খোলের ভেতর থেকে খুঁজে পেতে নিয়ে এলাম বেশ লম্বা একটা দেশলাই-কাঠ। আগুন ধরিয়ে দিলে ধীরে ধীরে পুড়তে থাকে এই দেশলাই-কাঠ। আমি যে টুকরোটা নিয়েছি সেটা পুড়তে কমপক্ষে দু'ঘণ্টা সময় লাগবে। কাঠটার এক মাথা ঢুকিয়ে দিলাম বারুদের ভেতর। অন্য মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে নৌকায় উঠলাম আমি। ছেলেরা আগেই উঠে পড়েছে। পাল তুলে দিতেই তরতরিয়ে এগোল নৌকা। দুপুরের আগেই ফিরে এলাম তীরে। টেন্ট হাউসে পৌঁছেই আবার রওনা হওয়ার জন্যে তৈরি করে রাখলাম নৌকা। কয়েক মিনিটও যায়নি, শুনতে পেলাম বিস্ফোরণের আওয়াজ।

হৈ-চৈ করে হাততালি দিয়ে উঠল ছেলেরা। তবে বেশিক্ষণ এ নিয়ে সময় নষ্ট করতে দিলাম না ওদের। আবার নৌকায় চাপলাম আমরা।

জাহাজে ফিরে দেখলাম বড় সড় একটা গর্ত তৈরি হয়েছে রেলিংয়ে। ঐ গর্ত দিয়ে অনায়াসে সাগরে নামানো যাবে পানসিটাকে।

পানসি পানিতে ভাসাতে ভাসাতেই বিকেল হয়ে গেল। জাহাজের গায়ে ওটাকে ভালো করে বেঁধে আমরা ফিরে এলাম তীরে।

পরদিন ভোরে আবার গেলাম জাহাজে। ভাসানোর আগেই মাস্তুল লাগিয়ে ফেলেছিলাম পানসিতে। এবার পাল খাটানোর আয়োজন শুরু হলো। টুকটাক কিছু জিনিস তৈরি করতে হলো। খোলের দু'এক জায়গা দিয়ে পানি উঠছে সামান্য। ফুটোগুলো বন্ধ করলাম। এবার পাল তুলে দিলেই হয়। কিন্তু আজ আর সময় নেই, আমাদের নিজেদের জাহাজে করে তীরে ফিরবো, কিছু মাল পত্র নিয়ে যাবো না সঙ্গে? তাছাড়া যাকে চমকে দেয়ার জন্যে এত আয়োজন তাকে বলতে হবে কাল যেন বিকেল নাগাদ টেন্ট হাউসে এসে থাকে।

পরদিন যথারীতি ভোর বেলায় এসে উঠলাম জাহাজে। যেখানে যা পেলাম নিয়ে তুললাম আমাদের ছোট্ট জাহাজ–পানসি নৌকায়। ছেলেরা ছোট ছোট দুটো

কামান বসিয়েছে ওটার দু'পাশে। এক পাউণ্ড করে ওজন একেকটার।

'তীরের কাছাকাছি পৌঁছে কামান দেগে আমাদের আগমন সংবাদ ঘোষণা করবো,' গম্ভীর গলায় বললো আর্নেস্ট।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' ওকে সমর্থন করলো জ্যাক।

'ঠিক আছে,' বললাম আমি।

অনুমতি পেয়েই ওরা দুজন কামান দুটোয় বারুদ ভরতে শুরু করলো।

দুপুরের পরপরই সব কিছু তৈরি হয়ে গেল। দড়ি খুলে দিলাম আমরা। এক এক করে উড়িয়ে দিলাম সব কটা পাল। আমাদের পুরোনো নৌকাটা বেঁধে নিয়েছি পানসির পেছনে। ফ্রিৎস দাঁড়িয়ে আছে মাস্তুলের কাছে, দড়িদড়া সামলাচ্ছে। আমি ধরেছি হাল। আর্নেস্ট আর জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে দু'পাশে কামান দুটোর পেছনে। দু'জনেরই হাতে জ্বলন্ত দুটো দেশলাই-কাঠ। নির্দেশ পাওয়া মাত্র কামানে অগ্নি সংযোগ করবে।

সেফটি বে-তে ঢুকলাম আমরা। অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেনের ভঙ্গিতে বড় পালটা নামিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলাম ফ্রিৎসকে। একটু কমলো পানসির গতি। তবে এখনো তরতরিয়ে এগোচ্ছে। একটু পরেই একে একে ছোট পালগুলোও নামিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলাম। আরো কমে গেল গতি। কয়েক মিনিটের ভেতর তীরের কাছে পৌঁছে গেল পানসি। কম্যাণ্ডার ফ্রিৎস চিৎকার করে উঠলো:

'আগুন দাও কামানে!'

এক সেকেণ্ড পরেই গর্জে উঠলো কামান। টেন্টহাউসের পেছনের পাহাড়ে লেগে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো আওয়াজ। আবার চিৎকার করলো ফ্রিৎস:

'এবার অন্যটা!'

দ্বিতীয় কামানটাও গর্জে উঠলো। গুরুগম্ভীর প্রতিধ্বনি শোনা গেল আবার।

দক্ষ নাবিকের মতো হাল ঘুরিয়ে আমি তীরে নিয়ে ভেড়ালাম পানসি। লাফ দিয়ে ডাঙায় নামলো ফ্রিৎস, আর্নেস্ট, জ্যাক। পিছু ফ্রান্সিস আর ওর মা বেরিয়ে এলো টেন্ট হাউসের পেছনের ছোট্ট একটা পাহাড়ের আড়াল থেকে। আনন্দে উদ্ভাসিত মুখ দু'জনের।

'ওহ কি ভয়-ই না পাইয়ে দিয়েছিলে আমাদের!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো এলিজাবেথ। 'তোমাদের এই জাহাজ দেখেই ঐ পাহাড়ের পেছনে গিয়ে লুকিয়েছিলাম আমি আর ফ্রান্সিস। যখন কামানের শব্দ শুনলাম তখন তো ভয়ে মরতে কেবল বাকি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কোনো অঘটন ঘটেনি! কিন্তু এই চমৎকার জাহাজটা তোমরা পেলে কোথায়? আমি যে ভীতু—সেই আমিও এতে চড়ে সাগরে যেতে ভয় পাবো না।'

গোপন কথাটা আমি খুলে বললাম এলিজাবেথকে। শুনে ভুরু কুঁচকে গেল ওর।

'হুঁ, তলে তলে এই কাজ করা হচ্ছিলো! আমাকে বললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো?'

'মহাভারত অশুদ্ধ হয়তো হতো না, তবে তোমাকে এই যে অবাক করে দিলাম, এটা বোধ হয় হতো না।'

BanglaBook.org

ছেলেরা এবার মা-কে আহ্বান জানালো জাহাজে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো চারদিক। পানসিটা তৈরি করতে পেরে আমরা যেমন গর্বিত, মনে হলো এলিজাবেথও তেমন গর্ব বোধ করছে। ওর গর্ব ওর স্বামী আর সন্তানরা। বিস্ময় মেশানো প্রশংসার দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে আমাদের দিকে।

আমার স্ত্রীর নাম অনুসারে আমি পানসিটার নাম রাখলাম *এলিজাবেথ*। শোনার সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ করে উঠলো ছেলেরা।

'ঠিক, ঠিক, মা'র নামেই নাম হবে আমাদের জাহাজের,' বলতে বলতে দুটো কামানেই বারুদ ভরে আর একবার ফাঁকা আওয়াজ করলো ওরা, সেই সাথে হাতে তালি দিয়ে চিৎকার, 'হুররে···!'

চোদ্দ

পানসি জাহাজ *এলিজাবেথ* কে ঠিক মতো পাড়ের সঙ্গে বেঁধে বাড়ির পথে রওনা হলাম আমরা। প্রত্যেকেই কাঁধে বা হাতে তুলে নিয়েছি কিছু না কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস! এই জিনিসগুলো আমরা পানসিতে করে নিয়ে এসেছি বিধ্বস্ত জাহাজ থেকে।

টেন্ট হাউস পেছনে ফেলে কিছুদূর এগোনোর পর এলিজাবেথ বললো, 'ভেবো না এই ক'দিন আমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থেকেছি আর কেবল দুশ্চিন্তা করেছি তোমাদের জন্যে। তোমাদের মতো আমি আর ফ্রান্সিসও কিছু কাজের কাজ করেছি এখানে–অবশ্যই আমাদের সাধ্যে যতটুকু কুলিয়েছে ততটুকু! আমরা একটা সবজি বাগান করেছি। পথেই পড়বে। চলো, দেখাবো।'

পিচ্চি ফ্রান্সিসের হাত ধরে আগে আগে চলেছে আমার স্ত্রী। নদীর ওপরের সেতু পেরিয়ে আমরা ফ্যালকনস নেস্ট-এর দিকে না গিয়ে জ্যাকল রিভারের পাড় ধরে এগিয়ে চললাম ওর পেছন পেছন। পাহাড় থেকে জলপ্রপাত যেখানে নদীতে পড়ছে সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম বাগানটা। ছোট্ট, সুন্দর, ছিমছাম।

এ জায়গার মাটি খুব ভালো। কাছেই নদী। ফলে পানির কোনো অভাব নেই। একটু দূরে কয়েকটা বড় বড় গাছ। বাগানে কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে পড়লে সেগুলোর ছায়ায় দিব্বি বিশ্রাম নিয়ে নেয়া যায়। বাগানে আলু, ভুট্টা, শিম, বাঁধাকপি, লেটুস এবং আখের জন্যে আলাদা আলাদা জায়গা করে চারা লাগানো হয়েছে। চমৎকার ভাবে কুপিয়ে ঝুরঝুরে করা হয়েছে মাটি। একটু উঁচু জায়গায় লাগানো হয়েছে আনারস আর তরমুজ গাছ। জাহাজ থেকে আমরা যে বীজ এবং চারা নিয়ে এসেছিলাম সেগুলো ফেলে না রেখে লাগিয়ে দিয়েছে ফ্রান্সিস আর ওর মা।

সত্যিই বাগানটা দেখে খুব আনন্দ হলো আমার। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, 'খুব ভালো একটা কাজ করেছো তোমরা! ভেবে অবাক হচ্ছি কি পরিশ্রমই না করতে হয়েছে তোমাদের! আর আমাদের মতো তোমরাও সম্পূর্ণ

গোপন রেখেছিলে ব্যাপারটা!'

'কি আর করবো? আমি খুব ভালো করেই বুঝতে পারছিলাম তোমরা কিছু একটা গোপন করছো–শেষে একদিন প্রকাশ করে চমকে দেবে আমাকে। সুতরাং আমি আর ফ্রান্সিসও তৈরি হলাম তোমাদের অবাক করে দেয়ার মতো একটা কিছু করার জন্যে। আমার মনে হয় তোমাদের মতো আমরাও সফল হয়েছি, কি বলো?'

সে আর বলতে? মুচকি হেসে বাড়ির পথে এগোলাম আমরা।

পরের কয়েকটা দিন কঠোর পরিশ্রম করতে হলো। একমাত্র কাঠামোটা ছাড়া জাহাজের আর সব কিছু তীরে এনে ফেলতে পেরেছি আমরা। টেন্ট হাউসের ছোট্ট তাঁবুটায় সামান্য কিছু জিনিস রাখা গেছে, হাতে হাতে ফ্যালকনস নেস্টে নিয়ে এসেছি কিছু। বাকি সব পড়ে আছে টেন্ট হাউসের সামনে খোলা আকাশের নিচে। যে কোন দিন ঝড়-বাদল এসে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে ওগুলোর অনেক কিছুই নষ্ট হবে। তাই ঝড়বাদল আসার আগেই জিনিসগুলো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলতে হলো।

বারুদ, খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড় বা যন্ত্রপাতির মতো জিনিস রাখলাম তাঁবুর ভেতরে; কিছু কিছু নিয়ে এলাম গাছের ওপরের ঘরে। কাঠ-খুঁটি, লোহা লক্কড় আপাতত ফাঁকা জায়গায় রইলো। প্রবল ঝড়ের মুখে যে কোনো সময় উড়ে যেতে পারে তাঁবু। তার আগেই আরো নিরাপদ একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে জিনিসগুলো রাখার জন্যে।

পরের দিন ক'টাও বেশ খাটুনির ভেতর দিয়ে গেল। প্রতিদিন ছেলেরা তীর ছোঁড়ার অভ্যাস করে। বারুদ ফুরিয়ে গেলে তীর ধনুকই হবে আমাদের একমাত্র অস্ত্র। সুতরাং এখন থেকেই হাত পাকিয়ে নেয়া দরকার। গাছে চড়ার ব্যাপারে কঠোর অনুশীলন করছে ছেলেরা। ব্যাপারটাকে খেলা হিসেবেই নিয়েছে ওরা। কিন্তু খেলার ছলে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ শিখে ফেললো বড় তিন ছেলে। গাছে চড়ার ব্যাপারে বানরের মতো দক্ষ হয়ে উঠলো কয়েক দিনের ভেতরেই।

জাহাজ থেকে আনা গাড়ির চাকা দুটো দিয়ে সুন্দর একটা টানা গাড়ি বানিয়েছি। গরু এবং গাধাটাকে দিয়ে টানাই আমরা ওটা। এখন মালপত্র পরিবহনের কাজ আরো সহজ হয়ে গেছে। গাছের ওপরের ঘরটাকেও আরেকটু মজবুত এবং বাসযোগ্য করেছি। নতুন কিছু আসবাবপত্রও তৈরি করা হয়েছে।

কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে নতুন করে কয়েকবার ঘুরে ফিরে দেখে নিলাম দ্বীপের বিভিন্ন অংশ। কোথাকার মাটি, গাছপালা, পরিবেশ কেমন; কোথায় কি ধরনের জিনিস পাওয়া যেতে পারে মোটামুটি জানা হয়ে গেছে! প্রতিবারই সঙ্গে নিয়েছি আমাদের টানা গাড়িটা, ফেরার পথে ফল-মূল, কাঠ খুঁটিতে প্রায় বোঝাই দিয়ে এনেছি ওটা।

কঠোর পরিশ্রম করছি ঠিকই, তবে একটা ব্যাপার আমরা নিয়ম করে মেনে চলছি–রবিবারে কোনো কাজ নয়। সকালে উঠে প্রার্থনা করি, দিনের বাকি সময়টা কাটিয়ে দিই গল্পগুজব করে বা বেড়িয়ে।

দ্বীপের বিভিন্ন এলাকা পর্যবেক্ষণ করতে বেরিয়ে বেশ কিছু নতুন আবিষ্কার করেছি আমরা। খাদ্য ছাড়াও নানা ধরনের জিনিস রয়েছে সেগুলোর ভেতর। বেশির ভাগই উদ্ভিদজাত। যেমন–পেয়ারা, কালো জাম। ক্যাণ্ডল-বেরি নামক এক ধরনের গাছ আবিষ্কার করেছি যার ফল থেকে মোমের মতো এক রকম পদার্থ পাওয়া যায়। এই ফল দিয়ে মোমবাতি তৈরি করেছি। রাতে এখন আর অন্ধকারে থাকতে হয় না আমাদের।

রাবার গাছেরও খোঁজ পেয়েছি দ্বীপে। অনেক দিন আগে একটা বই-এ পড়েছিলাম কি করে কাঁচা রাবার প্রক্রিয়াজাত করতে হয়। কৌশলটা মনে আছে এখনো, ফলে খুব শিগগিরই জুতার তলী বানানোর মতো কিছু পাকা রাবার তৈরি করে ফেলতে পারলাম। জুতার তলী বানানো ছাড়াও নানা কাজে আমরা এখন রাবার ব্যবহার করছি।

একদিন একটা তোতা পাখি ধরে আনলো ছেলেরা। বাচ্চা। এখনো ভালো করে উড়তে শেখেনি। ছোট একটা গাছের ডালে বসে ছিলো। চমৎকার দেখতে। সবুজ রঙ। বাঁশ দিয়ে একটা খাঁচা বানিয়ে তার ভেতর রেখে দিয়েছি তোতাটাকে। ছেলেরা মহাউৎসাহে কথা শেখাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটা শব্দ শিখে ফেলেছে সে। ছেলেরা আশা করছে খুব শিগগিরই পুরোদমে আলাপ চালাতে পারবে পাখিটার সঙ্গে।

ফ্রিৎস একটা ঈগল পাখির বাচ্চা ধরে এনেছে। যত্ন করে পুষছে ও বাচ্চাটাকে। কিছু দিনের ভেতর বেশ পোষ মেনে গেল ওটা। উড়তে শিখলো। ফ্রিৎস ওকে শিকার ধরার কৌশল শিখিয়েছে। এখন পাখিটা বাজের মতো ছোঁ মেরে ছোটখাটো পাখি–এমন কি বাচ্চা হাঁস-মুরগি পর্যন্ত ধরে এনে দেয় আমাদের।

বিধ্বস্ত জাহাজটায় আর কখনো যাইনি আমরা। প্রয়োজনীয় প্রতিটা জিনিস ওখান থেকে নিয়ে এসেছি তীরে। হয়তো ভবিষ্যতে কাজে লাগবে, এই ভেবে অপ্রয়োজনীয় বহু জিনিসও এনেছি। অবশেষে জাহাজটাকে উড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। সাগরের ঢেউ আর স্রোত ওটার টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া কাঠ-তক্তা ভাসিয়ে নিয়ে আসবে তীরে। ভবিষ্যতে যদি কখনো মাটিতেই বড় সড় একটা ঘর বানাতে চাই তাহলে আর কাঠের অভাব হবে না।

সুতরাং শেষবারের মতো বিধ্বস্ত জাহাজটায় গিয়ে উঠলাম আমি। সঙ্গে ফ্রিৎস। বড় এক পিপে ভর্তি বারুদ নিয়ে এসেছি। মনে মনে একটা হিসেব করে নিলাম কতটা বারুদ বসাতে হবে জাহাজের খোলে। সেই মতো বারুদ বসিয়ে পিপের এক পাশে ছোট্ট একটা ছিদ্র করে তাতে ঢুকিয়ে দিলাম লম্বা একটা টুকরো দেশলাই-কাঠ। কমপক্ষে তিন ঘণ্টা লাগবে সম্পূর্ণ কাঠটা পুড়ে বারুদে আগুন লাগতে। ততক্ষণে *এলিজাবেথ*-এ চড়ে আমরা নিরাপদে তীরে পৌঁছে যাবো।

জাহাজে নেয়ার মতো আর কিছুই নেই জেনেও শেষ বারের মতো খুঁজে দেখলাম, বেখেয়ালে দরকারী কিছু ফেলে গেছি কিনা। কয়েকটা বিরাট বিরাট খালি পিপে, কাপড় ভর্তি কয়েকটা সিন্দুক, একটা ভারি কামান আর তিন চারটে ইয়া মোটা মোটা তামার কড়া ছাড়া আর কিছু নজরে পড়লো না।

BanglaBook.org

কাপড়ের সিন্দুক ক'টা পানসিতে তুললাম, খালি পিপে ক'টাও।

'কামান আর কড়াগুলোই বা রেখে যাই কেন?' বললো ফ্রিৎস। কোনো ম তীরে নিতে পারলে টেন্ট হাউসের সামনে বসিয়ে দেবো কামানটা।'

'বেশ, চলো তাহলে, চেষ্টা করে দেখা যাক ওটা পানসিতে তুলতে পা কিনা।'

কিন্তু চেষ্টা করে লাভ হলো না। কামানটা বেজায় ভারি। দু'জন মাত্র মানু আমরা। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে ওটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে ডেকের কিনারে আনে পারলেও পানসিতে ওঠাতে পারলাম না। অবশেষে একটা বুদ্ধি করলাম। খা পিপেগুলো আবার ওঠালাম জাহাজে। সবগুলো এক সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে প কামানটাও শক্ত করে বেঁধে দিলাম সেগুলোর সঙ্গে। বিস্ফোরণের ফলে জাহা ভেঙে গেলে কামানটাকে নিয়ে ভাসতে থাকবে পিপেগুলো। তারপর পানসি পেছনে বেঁধে তীরে নিয়ে গেলেই চলবে।

বারুদের পিপেতে লাগানো দেশলাই-কাঠে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পানসি উঠলাম আমি আর ফ্রিৎস।

বিস্ফোরণের আগেই সেফটি বে-তে পৌঁছে গেল *এলিজাবেথ*। ঘাটের সা ঠিক মত পানসিটাকে বেঁধে অপেক্ষা করতে লাগলাম বিস্ফোরণের।

এলিজাবেথ আর ছোট তিন ছেলেও হাজির হয়েছে টেন্ট হাউসে। সবাই দু দুরু বুকে অপেক্ষা করছে, কখন হয় বিস্ফোরণ। দূরে প্রায় বিন্দুর মতো দে যাচ্ছে দুই ডুবো পাহাড়ের মাঝখানে আটকে থাকা ভাঙা জাহাজটা।

অবশেষে হলো বিস্ফোরণ। আচমকা কমলা রঙের এক ঝলক আলো দে গেল। তারপর অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম, তীব্রবেগে চার পাশে ছড়িয়ে পড় জাহাজের ভাঙাচোরা টুকরো। পরমুহূর্তে কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল ডু পাহাড় দুটো। কয়েক সেকেণ্ড পর আমাদের কানে ভেসে এলো গুরুগম্ভী আওয়াজটা।

সভ্য দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের শেষ যোগসূত্রটাও ছিন্ন হয়ে গেল। আর কখ কি আমরা জন্মভূমির দেখা পাবো? সবার মুখ ভার হয়ে উঠেছে। চোখের কো পানি চিক চিক করে উঠতে দেখলাম আর্নেস্টের। একমাত্র ব্যতিক্রম এলিজাবেথ দুঃখ পাওয়া দূরে থাক রীতিমতো খুশি খুশি দেখাচ্ছে ওকে—সম্ভবত আমরা যখ তখন আর ঐ জাহাজে গিয়ে ওর দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারবো না ভেবেই।

বেশিক্ষণ আমরা মুখ ভার করে থাকার সুযোগ পেলাম না। চোখে দূরবী লাগাতেই দেখতে পেলাম ডুবো পাহাড়গুলোর কাছে সাগরে ভাসছে কয়েক পিপে।

'নিঃসন্দেহে কামান বাঁধা পিপেগুলো!' বললাম আমি।

দেরি না করে পানসিতে উঠলাম আমরা। পাল তুলে ছুটে গেলাম ডু পাহাড়গুলোর দিকে। কামান বাঁধা পিপেগুলো পানসির পেছনে বেঁধে নিয়ে ফি এলাম তীরে।

BanglaBook.org

পরের কয়েকটা দিন আমরা ব্যস্ত রইলাম বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া জাহাজের কাঠ সংগ্রহের কাজে। সাগরের স্রোত আর ঢেউ দ্বীপের সৈকতে ভাসিয়ে এনেছে সেসব। সৈকত থেকে টানা গাড়িতে করে ফ্যালকনস নেস্ট-এ নিয়ে গেলাম কাঠগুলো। টেন্ট হাউসের সামনে সেফটি বে-তে ভাসমান অবস্থায় পেলাম প্রচুর কাঠ। পানসিতে চড়ে সংগ্রহ করলাম সেগুলো। ছোট টুকরোগুলো আমি আর ছেলেরা মিলে তুলে ফেললাম পানসিতে। বড় আর ভারিগুলো রশি দিয়ে বেঁধে টেনে আনলাম তীরে। সেখান থেকে টানা গাড়িতে করে কাঠগুলো নিয়ে যাওয়া হলো ফ্যালকনস নেস্ট-এ। শার্ক আইল্যাণ্ডের সৈকত থেকেও সংগ্রহ করা গেল অনেক কাঠ।

এরপর টেন্ট হাউসকে সুরক্ষিত করার দিকে মন দিলাম আমরা। পালের কাপড় দিয়ে বানানো মূল তাঁবুটার চারপাশে দুর্গের মতো দেয়াল তুলে ফেললাম কাঠ দিয়ে। দেয়ালের বাইরে চারপাশ ঘিরে গভীর একটা পরিখা খনন করা হলো। দুর্গের প্রবেশ মুখে বসিয়ে দিলাম দুটো ছোট কামান।

এরপর একদিন ঠিক করলাম কেপ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট থেকে একটা চক্কর দিয়ে আসবো। আগের মোমাবাতিগুলো ফুরিয়ে এসেছে। নতুন করে তৈরি করতে হবে। তাই কিছু ক্যাণ্ডল-বেরি সংগ্রহ করা দরকার। কেপ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট-এ প্রচুর ক্যাণ্ডল-বেরি গাছ আছে। তাছাড়া ওখান থেকে পেয়ারা, আখ আর নারকেলও সংগ্রহ করে আনা যাবে।

এলিজাবেথ আর ছেলেদের কাছে প্রস্তাবটা রাখতেই লাফিয়ে উঠলো সবাই। ওরাও যাবে। আমার পক্ষ থেকে আপত্তির কোনো কারণ নেই। সুতরাং পরদিন সকালে রওনা হলাম।

আমি আর বড় তিন ছেলে হেঁটে চলেছি। এলিজাবেথ আর ফ্রান্সিস টানা গাড়িতে। যথারীতি গাধা আর গরুটাকে জুড়ে দিয়েছি গাড়ির সঙ্গে। হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে গাড়িটা। আমি আর ফ্রিৎস একেবারে সামনে। দুজনেই সশস্ত্র—কাঁধে বন্দুক, হাতে কুঠার। আমাদের পেছনে আর্নেস্ট আর জ্যাক। কথার খই ফুটছে ওদের মুখে। কড়া করে বারণ করে দিয়েছি বলে এখনো ওরা পেছনে আছে, নইলে কখন ছুটে চলে যেতো আমাদের পেছনে ফেলে! সব শেষে টানাগাড়ি। ফ্রান্সিসের একটার পর একটা কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছে ওর মা।

ইতিমধ্যে একটু বড় হয়েছে ফ্রিৎস-এর বানরছানা। ফ্রিৎস যেখানেই যায় সঙ্গে নিয়ে যায় ওটাকে। আজও আছে ওটা ওর কাঁধে।

বেশি দ্রুত এগোতে পারছি না আমরা। কারণ ঝোপঝাড় কেটে টানা গাড়ির জন্যে পথ তৈরি করতে হচ্ছে। তাছাড়া একটু পর পরই থেমে কিছু না কিছু কাজ

BanglaBook.org

করতে হচ্ছে।

রাবার ঝোপের কাছে থামলাম প্রথমে। পাকা লাউ-এর শক্ত খোল কে বানানো বাটি বেঁধে দিলাম কয়েকটা গাছের কাণ্ডের সঙ্গে। কাণ্ডগুলোর বাক এমনভাবে চেঁছে দিলাম যেন তরল রাবার (অর্থাৎ রাবার গাছের কষ) গড়িয়ে জ হয় বাটির ভেতর। ফেরার পথে বাটিগুলো খুলে নিয়ে যাবো।

এরপর পেয়ারা বাগানের দিকে এগোলাম আমরা। পাকা এবং ডাঁশা পেয়া দিয়ে প্রায় ভর্তি করে ফেললাম একটা বস্তা। বস্তাটা গাড়িতে তুলে আখ-ব গেলাম। বেশ কয়েকটা মোটা, লম্বা আখ কেটে নিয়ে বড় ছুরি দিয়ে ওগুলোর ভালোমতো পরিষ্কার করে উঠিয়ে দিলাম গাড়িতে।

আবার এগোলাম আমরা। একটু পরেই পৌঁছে গেলাম ক্যাণ্ডল-বে গাছগুলোর কাছে। অসংখ্য চেনা অচেনা পাখির ভিড় সেখানে। গাছের নিচে প থাকা ফল খাচ্ছে। শিগগিরই আরো একটা বস্তা ভরে ফেললো ছেলেরা ক্যাণ্ড বেরি দিয়ে। পাখিদেরকে মহানন্দে খেতে দেখে আমাদের জ্যাকেরও ইচ্ছে হ খেয়ে দেখে দু'একটা ক্যাণ্ডল-বেরি। তবে দুই পর্যন্ত আর যেতে হলো না, এক ফল মুখে দিয়েই থুথু করে ফেলে দিলো–অসম্ভব কসটা ফল।

অবশেষে পৌঁছুলাম কেপ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর শেষ প্রান্তে সাগর তীরে চমৎকার একটা উপসাগর ঘিরে রেখেছে ডাঙা থেকে বেরোনো ছোট্ট ভূখণ্ডটাকে অসংখ্য নারকেল গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সাগরের কোল ঘেঁষে কোথাও কোথাও ঝোপ ঝোপ মতো হয়ে জন্মেছে নানা গাছ। যেখানে কোনো গা নেই, ফাঁকা, সে জায়গাগুলো সবুজ ঘাসে ছাওয়া।

'কি সুন্দর জায়গা!' চিৎকার করে উঠলো ছেলেরা। ওদের মা আর ফ্রান্সি লাফ দিয়ে নেমে পড়লো গাড়ি থেকে। গলা মেলালো ছেলেদের সাথে। 'ক নারকেল গাছ দেখেছো! সাধ মিটিয়ে নারকেল খাবো আজ। বাসায়ও নিয়ে যাবে কিছু পরে খাওয়ার জন্যে।'

গাছের নিচে প্রচুর ঝুনা নারকেল পড়ে আছে। কিন্তু খাওয়ার জন্যে সংগ্র করতে গিয়ে দেখা গেল বেশিরভাগ থেকেই গাছ গজিয়ে গেছে। প্রথমে এক হতাশ হলো ছেলেরা। গাছ বেরোনো নারকেল খাবে কি করে? মুহূর্ত পরে সমাধান খুঁজে পেয়ে আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠলো ওরা।

'এতদিন গাছে চড়া অভ্যাস করলাম কি খামোকা?' বললো ফ্রিৎস আ জ্যাক।

একেক জন একেকটা গাছের দিকে ছুটে গিয়ে উঠতে শুরু করলো গা বেয়ে। আর্নেস্ট গেল না। আর ফ্রান্সিসকে যেতে দিলো না ওর মা।

আবার হতাশ হতে হলো ওদের। দেখা গেল, কয়েক ফুট ওঠার পরই পিছ নেমে আসছে ওরা গাছের গুঁড়ি বেয়ে।

'এসো দেখি, কিছু সাহায্য করতে পারি কিনা তোমাদের,' বললাম আমি গাড়ি থেকে শক্ত, সামান্য মোটা দু'টুকরো দড়ি নিয়ে এগিয়ে দিলাম দু'জনে দিকে। 'দু'পায়ে বেঁধে নাও। ওঠার সময় খেয়াল রাখবে দড়িটা যেন গাছের গা যে খাঁজ আছে তাতে আটকায়।'

BanglaBook.org

কথা মতো কাজ করলো ওরা। একটু পরেই প্রায় ষাট সত্তর ফুট উঁচু দুটো গাছের মাথায় পৌঁছে গেল জ্যাক আর ফ্রিৎস। ফ্রিৎস-এর পেছন পেছন উঠে গেছে ওর বানর ছানাও। কয়েক সেকেণ্ড পর বৃষ্টির মতো মাটিতে পড়তে লাগলো কচি, ঝুনা, আধ-ঝুনা নারকেল।

সত্যি সত্যিই মনের সাধ মিটিয়ে নারকেল খেলাম আমরা। কাঁচা খাওয়ার জন্যে আধঝুনাগুলোই বেশি উপযোগী। খাওয়ার পর অবশিষ্টগুলো উঠিয়ে দিলাম গাড়িতে।

'আমার মনে হয় দ্বীপের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা এটা,' বললো ফ্রিৎস।

আর্নেস্ট আর জ্যাক সমর্থন করলো ওকে। 'তাহলে তো এখানেই আমরা নতুন করে আমাদের বাড়ি তৈরি করে নিতে পারি।'

'ফ্যালকনস নেস্ট ছেড়ে চলে আসবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'আমাদের সব্জি বাগান, ফলের গাছ, গাছের ওপর বাসা?' প্রশ্নবোধক চোখে তাকালাম ওদের দিকে। মাথা নেড়ে আবার বললাম। 'না-না, ফ্যালকনস নেস্ট অনেক আরামের, অনেক নিরাপদ। তোমরা চাইলে মাঝে মাঝে আমরা এখানে এসে বেড়িয়ে যাবো। ফ্যালকনস নেস্ট আমাদের বাড়ি–সত্যি কথা বলতে কি আমাদের নিজের হাতে তৈরি প্রথম বাড়ি। ও জায়গা ছেড়ে নড়তে আমি রাজি নই।'

'ঠিক,' সমর্থন করলো আমার স্ত্রী, 'আমারও মায়া পড়ে গেছে ফ্যালকনস নেস্ট-এর ওপর। তবে ওরা যা বলছে সেটাও ঠিক, এমন সুন্দর জায়গা আর হয় না।' একটু থেমে কি যেন চিন্তা করলো ও, তারপর যোগ করলো, 'আচ্ছা ছোটখাটো একটা ঘর তৈরি করা যায় না এখানে? আমরা যখন বেড়াতে আসবো তখন থাকতে পারবো সেই ঘরে। ঘর হয়ে গেলে কিছু দরকারী জিনিসপত্রও এনে রাখতে পারি এখানে।'

'ঠিক ঠিক, বাবা,' একসঙ্গে বলে উঠলো ছেলেরা, 'এখানেও একটা ঘর বানাই আমরা। তাহলে বেড়াতে এলে দিনে দিনে ফেরার জন্যে তাড়াহুড়ো করতে হবে না।'

আমারও মনঃপূত হল প্রস্তাবটা। এবং তখনই শুরু করলাম কাজ।

প্রথমে গাছের ডাল কেটে খুঁটি বানানো হলো। তারপর লতা পাতা এবং সরু সরু ডাল দিয়ে তৈরি করলাম চাল আর বেড়া। চালের জন্যে মূলত ব্যবহার করলাম নারকেল পাতা। খুঁটি আর বেড়া মজবুত করার জন্য ব্যবহার করলাম বাঁশ। সন্ধ্যার আগেই তৈরি হয়ে গেল ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটা। তৈরির পর দেখলাম আমাদের দেশী কুঁড়ে ঘরের চেয়ে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের উইগওয়াম-এর সঙ্গেই বেশি মিল পাওয়া যাচ্ছে ওটার। তা যাক, আমাদের প্রয়োজন পুরোপুরিই মিটবে এ ঘর থেকে, সুতরাং অসুবিধা নেই।

ঘর তৈরি শেষ। এবার একটু বিশ্রাম নিয়ে খাওয়া দাওয়া করবো। ইতিমধ্যে আমরা ঠিক করে ফেলেছি, আজ আর ফ্যালকনস নেস্ট-এ ফিরবো না, আমাদের নতুন ঘরে কাটাবো সামনের রাতটা।

ঘরটা কেমন হয়েছে, ভবিষ্যতে এ জায়গায় আর কি কি বানানো যেতে পারে এসব নিয়ে আলাপ করছি ছেলেদের সঙ্গে, এলিজাবেথ এক পাশে বসে খাওয়ার

BanglaBook.org

আয়োজন করছে, এমন সময় হঠাৎ মনে হলো কি একটা যেন নেই। আমরা যখন আসি তখন-ও ছিলো কিন্তু এখন নেই। ভালো করে তাকালাম চারদিকে। কি নেই কিছু বুঝতে পারলাম না। তারপর হঠাৎই চোখ গেল গরুটার দিকে। আরে তাই তো! গরুটা আপন মনে ঘাস খাচ্ছে কিন্তু গাধাটার কোনো চিহ্ন নেই কোথাও! ছেলেদের বলতে ওরাও বিস্মিত হলো। গেল কোথায় গ্রিয্‌ল?

শুরু হলো খোঁজ। আশপাশের ঝোপ-ঝাড়গুলোর আড়ালে দেখা হলো। নেই। টার্ক আর পনটোকে নিয়ে আর একটু দূরের কয়েকটা এলাকায়ও চক্কর দিয়ে এলাম আমি আর ফ্রিৎস। কিন্তু পাওয়া গেল না গ্রিয্‌লকে। সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়, আজ আর খুঁজে লাভ হবে না। ফিরে এলাম আমরা। দিনের আলো থাকতে থাকতেই খাওয়া সেরে নিয়ে আমাদের নতুন কুটিরে ঢুকে ঘুম। ছেলেদের সংগ্রহ করা শুকনো ঘাস-পাতার ওপর সঙ্গে আনা পালের কাপড় বিছিয়ে দিয়েছে এলিজাবেথ। বেশ আরামদায়ক হয়েছে বিছানাটা। তার ওপর দিনে কঠোর পরিশ্রম করেছি, নতুন জায়গা হওয়া সত্ত্বেও রাতের ঘুমটা ভালোই হলো।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। দুধ, সেদ্ধ আলু আর ডাচ পনির দিয়ে নাশ্‌তা খেতে খেতে ঠিক করে নিলাম দিনের কাজকর্মের তালিকা। প্রথম কাজ গাধাটাকে খুঁজে বের করা। ঠিক হলো জ্যাক আর কুকুর দুটোকে নিয়ে বেরোবো আমি, বড় দুই ছেলে থাকবে মা আর ছোট ভাইয়ের পাহারায়।

কুড়াল, বন্দুক আর নারকেল কাটার জন্যে একটা করাত নিয়ে রওনা হলাম আমি আর জ্যাক। বাঁশবনের কাছে পৌঁছে একটু খুঁজতেই নজরে পড়লো গ্রিয্‌ল-এর খুরের ছাপ। ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম আমরা। প্রায় এক ঘণ্টা চলার পর বাঁশবনের অপর প্রান্তে পৌঁছুলাম। বড় একটা বাঁশ ঝাড় পার হতেই সামনে দেখলাম সাগর। অল্প দূরে একটা নদী এসে পড়েছে সাগরে। বাঁশবন থেকে সাগরের দিকে কিছুদূর যাওয়ার পর নদীর দিকে মোড় নিয়েছে খুরের ছাপ।

খুবই নিচু নদীটার পাড়। পানির প্রায় সমান সমান। একেবারে পানি পর্যন্ত গেছে গাধার পায়ের ছাপ। মনে হয় নদী পেরিয়েছে গাধাটা। আমরাও নদী পার হলাম। বেশি গভীর নয় নদী, পার হতে অসুবিধা হলো না।

নদী পার হয়ে আবার দেখতে পেলাম খুরের ছাপ। ঠিক পানি থেকেই শুরু হয়েছে। আবার আমরা ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম। কিছুক্ষণ পর পৌঁছুলাম এক পাহাড়ী এলাকায়। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে গ্রিয্‌লের পায়ের দাগ। কৌতূহলী হয়ে উঠলাম আমি। কি আছে পাহাড়ের ওপাশে? সাগর? দ্বীপ শেষ হয়ে গেছে ওখানে? পাহাড় বেয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত নিলাম।

পাহাড়টার ঢাল বেয়ে উঠতে উঠতে চূড়া আর পাদদেশের মাঝামাঝি জায়গায় এসে পড়লাম। গাধার পায়ের ছাপ এখনো আমাদের সামনে। আরো কিছুদূর ওঠার পর খেয়াল করলাম অবাক হওয়ার মতো ব্যাপারটা—আরো কয়েকটা খুরের ছাপ যুক্ত হয়েছে সেটার সঙ্গে। সঙ্গী খুঁজে পেয়েছে আমাদের গ্রিয্‌ল?!

BanglaBook.org

অবশেষে চূড়ায় পৌঁছুলাম আমি আর জ্যাক। না, পাহাড়ের ওপাশেই শেষ হয়ে যায়নি দ্বীপ। সাগরের বদলে সেখানে বিছিয়ে আছে চমৎকার একটা বিস্তৃত সমভূমি। শান্ত সমাহিত চেহারা। দেখেই মনে হয় নিরবিচ্ছিন্ন শান্তির দেশ। সমভূমির ডান দিকে পাহাড়ের সারি। বাঁ দিকে নিচু সবুজ টিলা, নানা ধরনের গাছ জন্মেছে সেখানে। আমরা যে নদী পার হয়ে এসেছি সেটারই অংশ বয়ে চলেছে সবুজ সমভূমির মাঝ দিয়ে।

দৃশ্যটা এমন সুন্দর যে আমি কিছুক্ষণ তা উপভোগ করার লোভ সামলাতে পারলাম না। বসে পড়লাম পাহাড়চূড়ায়। জ্যাককে বললাম বসতে। আমার মতো ও-ও মুগ্ধ হয়ে গেছে জায়গাটার সৌন্দর্য দেখে। কোনো মানুষের চেহারা নজরে পড়লো না আমাদের। কোনো কুটির না, না কোনো চষা খেত। অসংখ্য পাখি আর অসম্ভব সুন্দর অগণিত রঙিন প্রজাপতি ছাড়া আর কোনো জীবিত প্রাণী দেখলাম না সেখানে।

আরো দূরে দৃষ্টি মেলে দিলাম। খালি সবুজ আর সবুজ। হঠাৎ এক জায়গায়, মনে হলো, কিছু একটা যেন নড়ছে। উঠে দাঁড়ালাম আমি। দেখতে হবে ওটা কি। আমার দেখাদেখি জ্যাকও উঠে দাঁড়িয়েছে। দ্রুত পায়ে আমরা নেমে যেতে লাগলাম পাহাড়ের ঢাল বেয়ে।

পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছেও দেখতে পাচ্ছি জিনিসটা। আগের মতোই নড়াচড়া করছে। আরেকটু এগোতে মনে হলো একটা জিনিস নয়, অনেকগুলো জিনিস নড়াচড়া করছে। সন্দেহ নেই জীবিত কোনো প্রাণী।

সবুজ সমভূমির ওপর দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর চিনতে পেরে শিউরে উঠলাম আমি। এক পাল বুনো মোষ। মনের সুখে চরে বেড়াচ্ছে কচি ঘাসে ছাওয়া সমভূমিতে! একেকটা মোষ কমপক্ষে আট ফুট উঁচু। প্রত্যেকটার মাথায় ভয়ঙ্কর বাঁকানো শিং। শিংগুলোর এ প্রান্তে থেকে ও প্রান্তের দূরত্ব হবে পাঁচ ফুট। পুরো পাল দূরে থাক, একটাই যদি ক্ষেপে ওঠে, কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর খুন করে ফেলতে পারবে আমাদের। ভয়ার্ত চোখে দুজনে তাকিয়ে রইলাম।

আপন মনে চরছে মোষগুলো। ভাবভঙ্গি দেখে বোঝার উপায় নেই আমাদের দেখেছে কিনা। দেখুক বা না দেখুক, পা টিপে টিপে পিছিয়ে আসতে লাগলাম আমি আর জ্যাক। কিন্তু কপাল খারাপ, আমাদের কুকুর দুটো হঠাৎ করেই যেন দেখে ফেললো মোষের পালটাকে। এতক্ষণ ওরা আমাদের পেছনে পেছনে ছিলো, মশগুল ছিলো নিজেদের ভেতর। হঠাৎ মোষের পালটাকে আবিষ্কার করতেই যেন পৌরুষ জেগে উঠলো ওদের। আমরা যে ভয়ে পিছিয়ে আসছি তা খেয়ালই করলো না। তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে গেল মোষগুলোর দিকে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো আমার হৃৎপিণ্ড।

নির্ভয়ে মোষের পালের একেবারে কাছে পৌঁছে গেল টার্ক আর পনটো। একই সঙ্গে, যেন যুক্তি করে লাফ দিল দুই কুকুর। দু'পাশ থেকে কামড়ে ধরলো ছোট একটা বাচ্চা মোষের দু'কান।

একসাথে গর্জন করে উঠলো সব ক'টা মোষ। পরমুহূর্তে ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়লো যেন। বুনো আক্রোশে খুর দিয়ে মাটি ঠুকতে ঠুকতে শিং উঁচিয়ে ছুটে

আসতে লাগলো মোষগুলো আমাদের দিকে। দেখেই গলা শুকিয়ে গেল আমার। জ্যাকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কাঁপছে থর থর করে।

'ভয় পেয়ো না, বন্দুক তুলে গুলি চালাও!' কোনো মতে বললাম আমি। পরমুহূর্তে কাঁধের কাছে চলে এলো আমার বন্দুকের বাঁট। একেবারে সামনের মোষটার দিকে তাক করে ঘোড়া টানলাম। এক সেকেণ্ড পর গর্জে উঠলো জ্যাকের বন্দুকটাও।

মুহূর্তে থমকে দাঁড়ালো পুরো পালটা। ভয় পেয়েছে গুলির শব্দে। তারপরই ঘুরে যে যে দিকে পারে ছুটলো। কিছুক্ষণের ভেতর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল মোষগুলো। তবে এখনো তাদের খুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমরা। দূর থেকে ভেসে আসছে দুড় ম-দুড় ম। কেবল মাত্র একটা মোষ রয়ে গেছে। পনটো আর টার্ক যে বাচ্চা মোষটাকে কামড়ে ধরেছে তার মা। মাথা নিচু করে শিং বাগিয়ে কুকুর দুটো দিকে তেড়ে গেল সেটা। দেরি না করে গুলি ছুঁড়লাম আমি। মুখ থুবড়ে পড়লো মোষটা। কিছুক্ষণ তড়পালো। তারপর স্থির হয়ে গেল।

বিপদ কেটে গেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। জ্যাকের সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়েছি আমি। ওকে বললাম সেকথা।

'যদি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করতে তাহলে আমরা দু'জনই মারা পড়তাম। বুকে সাহস সঞ্চয় করে দাঁড়িয়েছিলে এবং গুলি করেছিলে বলেই ভয় পেয়ে পালিয়েছে মোষগুলো। সব সময় এমনি সাহসের সাথে বিপদের মোকাবেলা করবে।'

কুকুর দুটো এখনও শক্ত করে ধরে আছে বাচ্চা মোষটার কান। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে শক্ত করে একটা দড়ি বেঁধে দিলাম ওটার পায়ে। ওর কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম টার্ক আর পনটোকে। কিছুক্ষণ পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দড়ি ছাড়ানোর চেষ্টা করল বাচ্চা মোষটা। শেষে ক্লান্ত হয়ে অসহায় ভঙ্গিতে শুয়ে পড়লো মাটিতে।

'কি শক্তি ওটার গায়ে!' প্রশংসা জ্যাকের গলায়। 'গাধার চেয়ে অনেক ভাল ভাবে গাড়ি টানতে পারবে ও। ভাবো তো, বাসায় নিয়ে যাওয়ার পর কেমন অবাক হবে মা!'

'তা না হয় হবে, কিন্তু ওকে বাসায় নিচ্ছি কি করে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'পা থেকে দড়ি খুলে নিলেই দৌড়ে পালাবে। কাঁধে করেও নেয়া সম্ভব নয় আমাদের দু'জনের পক্ষে। অনেক ভারি ওটা।'

'তাহলে?'

এক মুহূর্ত ভাবলাম আমি। 'একটা উপায় আছে। যদিও খুব নিষ্ঠুর উপায়, তবে কাজ হবে মনে হয়। পরে ওর সাথে ভাল ব্যবহার করে নিষ্ঠুরতাটুকু পুষিয়ে দেবো, কি বলো?'

'কি উপায়?'

'দেখ,' বলে কোমরের খাপ থেকে ছুরি বের করলাম আমি। মোষটার বাকি পাগুলোও এক সাথে করে বেঁধে ফেলে জ্যাককে বললাম মাথাটা চেপে ধরতে। তারপর নির্দয় হাতে ছুরি চালিয়ে ওটার দুই নাকের মাঝখানের নরম হাড়ে একটা ছিদ্র করলাম। এই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে একটা রশি ঢুকিয়ে বেঁধে দিলাম

BanglaBook.org

আলগোছে। বুঝতে পারছি ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছে জন্তুটা, কিন্তু নিরুপায় আমরা। যখন দড়ির বাঁধন থেকে নাক ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে তখন যন্ত্রণা বেড়ে যাচ্ছে কয়েক গুণ। ফলে একবার কি দুবারের পরই টানাটানি থামিয়ে চুপ করে পড়ে রইলো বাচ্চাটা।

এর পরেরটুকু সোজা। পুরোপুরি আমার ইচ্ছার অধীনে চলে এসেছে মোষটা। পায়ের বাঁধনগুলো খুলে দিলাম। দড়ি ধরে সামান্য টানতেই যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্যে উঠে দাঁড়ালো সে। দড়ি ধরে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। বাধ্য ছেলের মত পেছন পেছন চলতে লাগলো বাচ্চাটা। গ্রিয়লকে খুঁজে পাইনি বটে, তবে তাতে দুঃখ নেই; গাধার চেয়েও প্রয়োজনীয় একটা জন্তু নিয়ে আমরা ফিরে চলেছি।

ষোলো

পরদিন সকালে ফ্যালকনস নেস্ট-এর পথে যাত্রা শুরু হলো। গরুর সঙ্গে গাধার বদলে বাছুর মোষটাকে জুড়ে দিয়েছি গাড়ি টানার জন্যে। যে পথে এসেছিলাম সেপথেই ফিরছি, সুতরাং চলতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। আগের মতোই আমি আর বড় তিন ছেলে চলেছি হেঁটে, এলিজাবেথ আর ফ্রান্সিস গাড়িতে।

রাবার গাছগুলোর কাছে এসে থামলাম আমরা। কাঁচা রাবারে ভর্তি হয়ে আছে লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি বাটিগুলো। একটা একটা করে বাটি খুলে সাবধানে গাড়িতে রাখলাম। গড়িয়ে বা ছলকে যাতে না পড়ে যায় সেজন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হলো।

আবার শুরু হলো পথ চলা। খুব একটা দ্রুত চলতে পারছি না আমরা। পূর্ণবয়স্ক গাধার জায়গায় গাড়িতে জুড়তে হয়েছে একটা বাচ্চা মোষ। তাছাড়া নানা মালপত্রে ফেরার পথে গাড়ির ওজনও বেশ বেড়ে গেছে। প্রায় তরল রাবার যাতে ছলকে পড়ে নষ্ট না হয় সেজন্যেও ধীরে এগোতে হচ্ছে।

রাবার বন পেরিয়ে এখন ছোট ছোট ঝোপ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ তীব্র হুঙ্কারের শব্দ ভেসে এলো সামনে থেকে। স্বয়ংক্রিয়ের মত কাঁধ থেকে বন্দুকটা চলে এলো আমার হাতে। চোখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেলাম আমার দিকে চেয়ে আছে ফ্রিৎস আর জ্যাক। তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে গেল টার্ক একটা ঝোপের দিকে। পনটো-ও যোগ দিল তার সাথে। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গেলাম আমি। রক্তারক্তি একটা কাণ্ড হবে এবার! নির্ঘাত ভয়ঙ্কর কোনো জন্তু ঘাপটি মেরে বসে আছে ঐ ঝোপের আড়ালে!

বন্দুক বাগিয়ে পা টিপে টিপে এগোলাম আমি। একই ভঙ্গিতে বন্দুক হাতে পেছন পেছন আসছে ফ্রিৎস, আর্নেস্ট, জ্যাক। ঝোপটার একেবারে কাছে পৌঁছে গেছি। উঁকি মেরে দেখলো ফ্রিৎস, ঝোপের ভেতর শুয়ে আছে জন্তুটা। কালো মোষের মত বিরাট।

BanglaBook.org

গুলি করার জন্যে তৈরি আমি। এই সময় জ্যাক উঁকি দিলো ঝোপের ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে উঠলো:

'মেরো না বাবা, আমাদের সেই মাদী শুওরটা!'

এবার উঁকি দিলাম আমি। ঠিকই বলেছে জ্যাক। কি ভয়ই না পেয়েছিলাম। বন্দুক নামিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে ঝোপটার ভেতর ঢুকলাম আমরা।

আমাদের সেই মাদী শূকরটাই! লম্বা হয়ে শুয়ে আছে মাটিতে। সাতটা ছোট ছোট তুলতুলে প্রাণী হুটোপুটি করছে তার বুকের কাছে। বাচ্চা দিয়েছে শূকরটা! আমাদের দেখে মোটেই বিরক্ত হলো না সে, বরং মনে হলো, একটু যেন খুশিই হয়েছে। ঠিক করলাম পরে এক সময় এসে পুরো পরিবারটাকে নিয়ে যাবো আমাদের খামার বাড়ি অর্থাৎ ফ্যালকনস নেস্টে।

বেশ কিছু দিন ধরে একটা ব্যাপারে আমরা খুব চিন্তিত, বিশেষ করে আমার স্ত্রী। দড়ির মই বেয়ে গাছের ওপরের ঘরে ওঠা ওর পক্ষে কষ্টকর, বিপজ্জনকও। ফ্রান্সিসের ক্ষেত্রেও তা-ই। ও চায় একা একা উঠতে নামতে, কিন্তু ওর মা কিছুতেই দেবে না। সব সময়ই হয় আমি নয় তো ফ্রিৎস কাঁধে করে নামাই ওকে। সে সময় দড়ির মই বেয়ে ওঠা-নামা আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠে। শক্ত কাঠের মই বানানোর কথা ভেবেও বাদ দিয়েছি বুদ্ধিটা। চল্লিশ ফুট লম্বা একটা কাঠের মইয়ের যে ওজন হবে অত ভারি মই আমরা ক'জনে কিছুতেই খাড়া করতে পারবো না। বিকল্প কোন বুদ্ধি বের করতে হবে।

কেপ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট থেকে ফিরে আসার পরদিন সন্ধ্যায় খেতে বসে এলিজাবেথই বুদ্ধিটা দিল।

'আমাদের গাছের গুঁড়ির ভেতরটা ফাঁপা,' বললো ও। 'ওর ভেতরে একটা সিঁড়ি তৈরি করে নিলে কেমন হয়? ওঠা নামার অসুবিধা না হয় সহ্য করলাম, কিন্তু ঝড় বাদলের কথা একবার ভাবো। ঝড়ে যখন দুলতে থাকবে তখন আর যে-ই পারুক, আমি বাবা ঐ মই বেয়ে নামতে পারবো না।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটা আমার পছন্দ হয়ে গেল। ছেলেরাও খুব খুশি, বেশ কদিন পর করার মত একটা কাজ পেয়েছে ওরা।

পরদিন সকালেই সিঁড়ি তৈরির কাজ শুরু হলো। মহা উৎসাহে ছুটোছুটি লাগিয়েছে ছেলেরা। কখন কি করতে হবে, কোথা থেকে কি আনতে হবে এ নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে।

'প্রথমে দেখতে হবে গাছের গুঁড়িটা আগাগোড়া ফাঁপা কিনা,' বললাম আমি।

'কি করে বুঝবো?' ওদের প্রশ্ন।

'কাণ্ডের গায়ে শক্ত কিছু দিয়ে ঘা মারতে মারতে উপরে উঠতে হবে। যতদূর পর্যন্ত ফাঁপা আওয়াজ পাওয়া যাবে বুঝতে হবে ততদূর পর্যন্ত ফাঁপা।'

'এক্ষুণি আমরা উঠে যাচ্ছি শিকড় বেয়ে।'

'না না, শিকড় বেয়ে ওঠা বিপদ...!'

কথা শেষ করতে পারলাম না, তার আগেই দেখি কাণ্ডের প্রায় গা বেয়ে নেমে আসা তিনটে ঝুরি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে তিন ছেলে–ফ্রিৎস, আর্নেস্ট আর

BanglaBook.org

জ্যাক। প্রত্যেকের হাতে মোটা একেকটা লাঠি। বানরের মত অনায়াস দক্ষতায় কিছুদূর উঠে লাঠি দিয়ে বাড়ি মারছে কাণ্ডের গায়ে। ঢপ-ঢপ আওয়াজ হচ্ছে। অর্থাৎ ফাঁপা কাণ্ডের ঐ জায়গা পর্যন্ত। একটু একটু করে ঘর পর্যন্ত উঠে গেল ওরা। হ্যাঁ, কাণ্ডটার পুরো চল্লিশ ফুটই ফাঁপা। অর্থাৎ ঐ ফাঁপা জায়গায় একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি বানানো সম্ভব।

যেমন উঠেছিলো তেমনি শিকড় বেয়ে নেমে আসছে ছেলেরা। নামার সময়-ও একটু পর পরই ঘা মারছে কাণ্ডে। প্রায় নেমে এসেছে ওরা, এমন সময় একটা গুঞ্জন ধ্বনি ভেসে এলো আমার কানে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম কাণ্ডের গায়ে কয়েকটা ছোট ছোট গর্ত দিয়ে ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য মৌমাছি। ফাঁপা কাণ্ডের ভেতর মৌমাছিদের বাসা! বার বার কাণ্ডে আঘাত করায় বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা।

সোজা আমার ছেলেদের দিকে ধেয়ে গেল মৌমাছিগুলো। চোখের পলকে ফ্রিৎস, আর্নেস্ট আর জ্যাকের ঘাড়ে মুখে, গলায়, হাতে–মোট কথা শরীরের প্রতিটা অনাবৃত জায়গায় ফুটিয়ে দিলো অগণিত হুল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে শিকড় ছেড়ে দিলো ছেলেরা। ভাগ্য ভাল মাটি থেকে বেশি উপরে ছিলো না ওরা, থাকলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো।

আমি আর এলিজাবেথ বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর তাড়াতে পারলাম হিংস্র পতঙ্গগুলোকে। সেদিনের মতো ইতি টানতে হলো কাজের। ছেলেদের পরিচর্যায় কেটে গেল দিনের বাকি সময়টুকু। ঠিক চাকের ওপর ঘা মেরেছিলো জ্যাক, ফলে ওর অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয় করে ছেড়েছে মৌমাছিরা। অন্যদের অবস্থাও গুরুতর, তবে ওর মতো অতটা নয়। ওষুধপত্র কিছু নেই আমাদের কাছে, তাই দেশগাঁয়ে প্রচলিত ওষুধ–হুল বেঁধা জায়গা থেকে হুল তুলে ফেলে কাদা লেপে দেয়া ছাড়া আর কোন চিকিৎসা করতে পারলাম না। কিছুক্ষণের ভেতর মুখগুলো ফুলে ঢোল হয়ে গেল তিন ছেলের। জ্যাকের চেহারা চেনাই যায় না।

হঠাৎ খেয়াল হলো ক্রুদ্ধ মৌমাছিগুলো এখনও চাক্কর দিয়ে চলেছে গাছটার কাণ্ডের চারপাশে। ওরা এত রেগে গেছে যে কিছুতেই গুঁড়ির ভেতর ঢুকে চাকে বসতে পারছে না স্থির হয়ে–হয়তো ওখানে যাওয়া আর নিরাপদ মনে করছে না। তাড়াতাড়ি বিরাট একটা লাউয়ের খোলা একটা লম্বা লাঠির মাথায় উল্টো করে বেঁধে বসিয়ে দিলাম কিছুদূরে। একটু পরে দেখলাম একটা একটা করে মৌমাছি উড়ে গিয়ে বসতে শুরু করেছে ওটার ওপর। তারমানে গাছের কাণ্ডের ভেতর ঢোকা আর নিরাপদ মনে করছিলো না ওরা। কিছুক্ষণ পর দেখি লাউয়ের ভেতরেও ঢুকতে শুরু করেছে দু'-একটা মৌমাছি। লাউটার ওপর খড়কুটো দিয়ে একটা চালা মতো বানিয়ে দিলাম, যাতে রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারে মৌমাছিগুলো। এরপর কিছু তামাক পাতা জ্বেলে মৌমাছিদের পুরনো বাসায় ধোঁয়া দিতেই বাকি মৌমাছিগুলোও রাণীসহ উড়ে চলে গেল লাউটার ওপর। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো ওদের ক্রোধ। কয়েক দিনের ভেতর নতুন একটা চাক তৈরি করে ফেললো ওরা লাউটার ভেতর।

পরদিন সকালে দেখলাম মোটামুটি সুস্থ বোধ করছে ছেলেরা।

'কি খবর?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'কাজকর্ম কিছু করা যাবে আজ, না আরও বিশ্রাম লাগবে?'

'কেন, আরও বিশ্রাম লাগবে কেন?' উল্টো প্রশ্ন করলো ওরা, 'আমরা তো পুরোপুরি সুস্থ।'

আবার লাগলাম আমরা কাণ্ডের ভেতর সিঁড়ি তৈরির কাজে।

কাণ্ডটা যে আগাগোড়া ফাঁপা তা বোঝা গেছে কালই। এবার পরিষ্কার করতে হবে ভেতরটা। কিন্তু তার আগে মৌচাকটা সরাতে হবে কাণ্ডের ভেতর থেকে। কাণ্ডের গায়ের যে ফোকর দিয়ে কাল মৌমাছিদের বেরোতে দেখেছিলাম সেখানে উঠে গেলাম একটা মোটা ঝুরি বেয়ে। উঁকি দিতেই দেখলাম এখনো বেশ কিছু মৌমাছি রয়েছে সেখানে। আবার কিছুটা তামাক পাতা জ্বালতে হলো। কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া ফোকর গলে কাণ্ডের ভেতর ঢুকতেই পিলপিল করে বেরিয়ে এলো মৌমাছিগুলো। বাইরেও ধোঁয়া, ফলে কাণ্ডের আশপাশে ঘুরঘুর করতে পারলো না ওরা, সোজা উড়ে গিয়ে বসলো ওদের জন্যে তৈরি করা নতুন বাসায়। কয়েক মিনিটের ভেতর কাণ্ডের ভেতরটা সম্পূর্ণ মৌমাছিশূন্য হয়ে গেল। যে শিকড়টা বেয়ে আমি উঠেছি সেটার সঙ্গে আড়াআড়িভাবে একটা কাঠের টুকরো বেঁধে তার ওপর নিরাপদে বসার ব্যবস্থা করলাম। তারপর ভাল করে উঁকি দিলাম ভেতরে। দেখলাম ফাঁপা কাণ্ডের ভেতরের দেয়াল পুরোপুরি মৌচাকে মোড়া।

কুড়াল আর বাটালি দিয়ে কেটে ধীরে ধীরে ফোকরটা বড় করলাম—জাহাজের জানালা যে আকারের হয় তেমন। জাহাজ থেকে সবকটা জানালা খুলে এনেছি আমরা। ভাবছি সিঁড়ি বানানো হয়ে গেলে সেগুলোর একটা লাগিয়ে দেবো ফোকরটার মুখে।

কাণ্ডের ভেতর থেকে আস্তে আস্তে টুকরো টুকরো করে খসিয়ে আনলাম পুরো মৌচাকটা। প্রচুর পরিমাণ নির্ভেজাল মোম আর বড় বড় কয়েকটা লাউয়ের খোল ভর্তি টাটকা মধু পাওয়া গেল।

এরপর শুরু হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ।

প্রায় বিশ ফুট লম্বা একটা বাঁশের চটা ফোকর দিয়ে ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে উঁচু করে দিলাম। ছেলেদের একজনকে বললাম উপরে আমাদের ঘরে গিয়ে দেখতে পাটাতন ছাড়িয়ে সেটা ওঠে কিনা। একটু পরেই ও চিৎকার করে জানালো, 'হ্যাঁ উঠেছে!'

এরপর একটা রশিতে নুড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিলাম নিচের দিকে। ফুট বিশেক দড়ি ছাড়ার পর নিচ থেকে ভেসে এলো আকাঙ্ক্ষিত শব্দটা। ঠক! তার মানে এই বিশাল গাছের কাণ্ড নিচের দিকেও পুরোপুরি ফাঁপা, আশা করি একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি বানিয়ে ফেলা যাবে এর ভেতরে।

সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। কি কি, এবং কোনটার পর কোনটা করতে হবে, হিসেব করতেই ঘাবড়ে গেলাম মনে মনে। এতক্ষণ বেশ সহজই মনে হচ্ছিলো কাজটা। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যত সহজ মনে করেছিলাম তত সহজ হবে না। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হবে। ছেলেদের বললাম কথাটা। ওরা ঘাবড়ালো না মোটেই।

BanglaBook.org

'এক দিনে না পারি দশ দিনে তো পারবো,' বললো ওরা।

ছেলেদের উৎসাহ দেখে আমারও উৎসাহ ফিরে এলো।

কাণ্ডের যে পাশটা সাগরের দিকে সে পাশে গোড়ার দিকে একটা দরজা তৈরির কাজ শুরু করলাম প্রথমে। বহু দিনের পুরনো গাছ। কাঠ খুব শক্ত। তবু কুড়াল এবং হাতুড়ি-বাটালির সাহায্যে অবশেষে শেষ হলো দরজা খোঁড়ার কাজ। ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে যে দরজাটা চৌকাঠসহ খুলে এনেছি ঠিক সেটার মাপে কেটেছি এটা। সিঁড়ির কাজ শেষ হলে কেবিনের দরজাটা লাগিয়ে দেবো এই ফোকরে।

এর পর ফাঁপা কাণ্ডের ভেতরের গা থেকে পরিষ্কার করলাম পচা কাঠ। ফাঁপা অংশের যেসব স্থান অমসৃণ আর আঁকাবাঁকা মনে হলো সে জায়গাগুলোও কুড়াল দিয়ে চেঁছে সমান করা হলো। তারপর বারো ফুট লম্বা এবং এক ফুট মতো ব্যাসের একটা গাছের কাণ্ড ডালপাতা ছেঁটে এনে ঢোকালাম ফাঁপা কাণ্ডের ভেতর। ফাঁপা কাণ্ডের মাঝ বরাবর খাড়া করলাম ওটা। এবার ফাঁপা কাণ্ডের ভেতরের গায়ে এবং খাড়া-করা সরু কাণ্ডের বাইরের গায়ে নির্দিষ্ট উচ্চতায় একের পর এক খাঁজ কেটে গেলাম। এই খাঁজে খাঁজে বসিয়ে দিলাম একটা করে তক্তা। প্রথম তক্তাটা বসালাম মাটি থেকে সামান্য একটু ওপরে। তারপর একটা একটা করে তক্তা বসিয়ে চললাম ক্রমশ উপর দিকে।

বারো ফুটি কাণ্ডটার শেষ মাথায় শেষ তক্তাটা বসানোর পর একই রকম আরও একটা সরু কাণ্ড কেটে আনলাম বাইরে থেকে। কপিকল, চরকিকল ইত্যাদির সাহায্যে উঠিয়ে প্রথম কাণ্ডটার ওপর বসালাম সেটা। স্ক্রু এবং শক্ত বাতা দিয়ে নিচেরটার সঙ্গে আটকে দিলাম মজবুত করে। তারপর আবার খাঁজ কেটে কেটে তক্তা বসিয়ে দেওয়া। অবশেষে শেষ হলো আমাদের প্যাঁচানো সিঁড়ি। ইতিমধ্যে কোনদিক দিয়ে যে আস্ত একটা সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে খেয়ালই করিনি আমরা।

আসল কাজ শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু টুকটাক অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু কাজ এখনো বাকি রয়ে গেছে। এবার শুরু করলাম সে-কাজগুলো। নিচের ফোকরের মুখে লাগানো হলো জাহাজ থেকে আনা চৌকাঠসহ পাল্লাটা। ভেতর বার দু'দিক থেকেই বন্ধ করার ব্যবস্থা রাখা হলো সেটাতে। তারপর কাণ্ডের গায়ে কিছু দূর পরপরই জাহাজের জানালার আকৃতির একটা করে ফোকর তৈরি করে জাহাজ থেকে আনা জানালাগুলো লাগিয়ে দিলাম এ-সব ফোকরে। মৌচাক বের করার জন্যে যে ফোকরটা করেছিলাম সেটায়ও একটা জানালা লাগানো হলো। আলো বাতাসের কোনো অভাব আর রইলো না সিঁড়িতে। বৃষ্টি এলে জানালাগুলোর কপাট বন্ধ করে দিলেই হলো। পানি আর আসতে পারবে না ভেতরে।

এদিকে আমাদের খামারের আয়তন ক্রমে বড় হচ্ছে। সিঁড়ির কাজ শেষ হওয়ার ক'দিন পর একটা ছাগী দুটো বাচ্চা দিলো। আরো ক'দিন পর বাচ্চা দিলো ভেড়া। পাঁচটা। পনটোও বাচ্চা দিয়েছে। ছ'টা তুলতুলে কুকুর ছানা এখন ঘুর ঘুর করে ওর চারপাশে। বেশ ক'দিন ধরে একটা মুরগিকে খুঁজে পাচ্ছিলো না

BanglaBook.org

এলিজাবেথ। একদিন দেখা গেল মোটা একটা শিকড়ের নিচ থেকে কক-কক করতে করতে বেরিয়ে আসছে সেটা। পেছনে এক দঙ্গল ছানা। কয়েক দিন পরে অন্য একটা মুরগিও বাচ্চা ফোটালো। হাঁস এবং রাজ হাঁসগুলোও ছানা-পোনা উপহার দিয়েছে আমাদের। এমন কি আমাদের সেই হারিয়ে যাওয়া গ্রিয়্‌ল-ও ফিরে এসেছে একটা চমৎকার মাদী সঙ্গী নিয়ে।

গাধাটা যেদিন ফিরে আসে সেদিন ভীষণ চমকে গিয়েছিলাম আমরা। ব্যাপারটা ঘটেছিলো এভাবে:

ভোরে অদ্ভুত ভয়ঙ্কর এক আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল আমাদের। একটু পরে আবার শুনতে পেলাম আওয়াজ–অনেকটা হালুম-হুলুম ধরনের। ঝোপের দিক থেকে আসছে। মনে হলো হিংস্র কোনো জন্তু! সিংহ অথবা বাঘ! তাড়াতাড়ি বন্দুক নিয়ে তৈরি হলাম আমরা।

ইতিমধ্যে ফ্রিৎস বিছানা থেকে নেমে উঁকি দিয়েছে জানালা দিয়ে। কয়েক সেকেণ্ড আগ্রহী ভঙ্গিতে কিছু একটা খুঁজলো ওর চোখ। তার পরই হো-হো করে হেসে উঠলো সে।

'আমাদের পুরাতন গর্দভ!' বললো ফ্রিৎস। 'ফিরে এসে আগমন সংগীত শোনাচ্ছেন!'

আমিও জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের গাধাটাকে চিনতে অসুবিধা হলো না। কিন্তু সঙ্গে ওটা আবার কি? ঝোপের আড়ালে অর্ধেক ঢাকা পড়ে আছে জন্তুটার।

'হি! হও!' ডাক দিয়ে উঠলো গ্রিয়্‌ল।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর রবে জবাব দিলো অন্য জন্তুটা। পর মুহূর্তে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সেটা–এবং সেটা আরেকটা গাধা!

মনস্থির করে ফেললাম, ধরতে হবে বুনো গর্দভটাকে। চেষ্টা করবো পোষ মানাতে–যদিও জানি বুনো গাধা পোষ মানানো প্রায় অসম্ভব।

তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিচে নেমে এলাম আমি। ফ্রিৎস, আর্নেস্ট আর জ্যাকও এলো পেছন পেছন। ফ্রিৎস-এর এক হাতে খানিকটা শস্যদানা আন্য হাতে একটা দড়ির ফাঁস। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে দরজা খুলতেই দেখলাম তখনো ঝোপের আশপাশে ঘুর ঘুর করছে গাধা দুটো।

মুঠো ভর্তি শস্যদানা নিয়ে গ্রিয়্‌ল-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো ফ্রিৎস। ওকে দেখেই আনন্দের একটা চিৎকার করলো গাধাটা। খাবারের লোভে এগিয়ে এলো ধীরে ধীরে। বুনো গাধাটাও এলো পেছন পেছন। পায়ে পায়ে আমাদের একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালো দু' গর্দভ। হাতের শস্যটুকু মাটিতে নামিয়ে রাখলো ফ্রিৎস। খাওয়ার জন্যে মুখ নিচু করলো গিয়্‌ল। দেখাদেখি বুনোটাও। এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলো ফ্রিৎস। তারপর খপ করে দড়ির ফাঁসটা পরিয়ে দিলো বুনো গাধার গলায়। টেনে ধরলো রশিটা শক্ত হাতে।

ফাঁস আটকে গেল গাধার গলায়। মরীয়া হয়ে টানা হ্যাঁচড়া শুরু করলো সে। পা দিয়ে লাথি মারতে লাগলো মাটিতে। তাতে লাভের ভেতর এটুকু হলো, ফাঁসটা আরো চেপে বসলো তার গলায়! ইতিমধ্যে আর্নেস্ট, জ্যাক আর আমিও হাত

BanglaBook.org

লাগিয়েছি ফ্রিৎস-এর সাথে। টেনে নিয়ে গাধাটাকে বেঁধে ফেললাম একটা গাছের সাথে। আবার যেন পালাতে না পারে তাই আমাদের গ্রিয্‌লকেও বেঁধে রাখলাম তার পাশে। দুটোকেই ভালো খাবার দেয়া হলো। মনের আনন্দে খেতে শুরু করলো গ্রিয্‌ল। মাদী গাধাটা কিছুক্ষণ ফোঁস ফোঁস করলো, রশি ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করলো। তারপর পেটে টান পড়তেই শান্ত হয়ে খাওয়ায় মন দিলো।

নতুন একটা কাজ জুটলো আমাদের–বুনো গাধাটাকে পোষ মানানো। প্রতিদিন ছেলেরা ভালো ভালো খাবার দেয় ওটাকে; সেই সাথে তার গায়ে, গলায় হাত বুলিয়ে আদর করে, নানা ধরনের কথা আউড়ে ভজাবার চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম কাছে গেলেই অস্থিরভাবে পা ঠুকে প্রতিবাদ জানাতো গাধাটা। কিছুদিন বাদেই দেখা গেল তার আচরণে পরিবর্তন এসেছে। এখন সে আদর গ্রহণ করে পরিতৃপ্তির সাথে। তার মানে ওষুধ ধরেছে, পোষ মানছে ওটা। তবে এখনো পিঠের ওপর কিছু চাপাতে দেয় না। সে-চেষ্টা করলেই আবার বুনো হয়ে ওঠে সে। চার পা ছুঁড়ে রশি টানাটানি করে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করে।

শেষমেশ গাধাটাকে পুরোপুরি পোষ মানানোর জন্যে একটা বুদ্ধি করলাম। একদিন সকালে খাওয়া দাওয়ার পর আমি চড়ে বসলাম ওর পিঠে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মতো লাফিয়ে, মাটিতে পা ঠুকে আমাকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করলো সে। এক সেকেণ্ডও দেরি করলাম না আমি, প্রথম লাফটা দেয়ার সাথে সাথে মাথা নুইয়ে সর্বশক্তিতে কান কামড়ে ধরলাম ওর। আশ্চর্য ফল হলো। আর একটা কি দুটো লাফ দেয়ার পর শান্ত হয়ে গেল গাধাটা।

কান কামড়ে ধরে আছি আমি। একটু পরে ফ্রিৎস চড়ে বসলো আমার পেছনে। জ্যাকও ওর মার সাহায্য নিয়ে উঠে বসলো গাধার পিঠে। যখন নিশ্চিত হলাম দুই ছেলেই ঠিক মতো বসেছে আমার পেছনে তখন ধীরে ধীরে ছেড়ে দিলাম গাধার কান। হালকা চালে দু'তিনটে লাফ দিলো ওটা, তারপর ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলো সামনের দিকে। লাফালাফি একদম বন্ধ। এরপর আর কখনো পিঠে বসলে লাফ-ঝাঁপ করেনি গাধাটা।

'কোথায় শিখলে, কান কামড়ে পোষ মানানোর কৌশল?' জিজ্ঞেস করলো আমার স্ত্রী।

'এক ঘোড়া-পালকের কাছে,' জবাব দিলাম। 'লোকটা অনেক দিন আমেরিকায় কাটিয়েছে। আধাআধি পোষমানা ঘোড়াগুলোকে নাকি এভাবেই বশ করে আমেরিকানরা।'

কয়েক সপ্তার ভেতর মাদী গাধাটা পুরোপুরি পোষ মেনে গেল। আমরা সবাই এখন নির্ভয়ে ওর পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারি। ওটার নাম দেয়া হলো 'লাইট-ফুট'। বোধ হয় পোষ মানানোর সময় শক্ত পায়ে মাটিতে লাথি মারতো বলেই ছেলেদের মনে এসেছিলো নামটা।

BanglaBook.org

সতেরো

বহুদিন ধরে একটা দরকারী কাজ শেষ করার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম, কিন্তু হয়ে উঠছিলো না। লাইট-ফুটকে পোষ মানানোর পর একটু অবসর পেয়ে কাজটায় হাত দিলাম।

আমাদের বেশিরভাগ পোষা জন্তু ফ্যালকনস নেস্টের গোড়ায় কিছু মোটা মোটা শিকড়ের নিচে রাত কাটায়। এমন কি হাঁস-মুরগিগুলো পর্যন্ত একটা কোনা খুঁজে নিয়ে সেখানেই থাকে। ওদের জন্যে একটা স্থায়ী এবং নিরাপদ আবাস তৈরি করতে হবে। দু'পেয়ে আর চারপেয়ে জন্তুর এক সাথে থাকাটা এলিজাবেথের পছন্দ নয়। তাই পাখিগুলোর জন্যেও আলাদা বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা দরকার। তা না হলে যে কোনো দিন গরু, মোষ বা গাধার পায়ের তলে পড়ে চেপ্টা হতে পারে মুরগি বা হাঁসের বাচ্চা।

উঁচু, মোটা শিকড়গুলোর ওপর চালা দেয়ার মাধ্যমে শুরু করলাম। বাঁশ ব্যবহার করলাম এ কাজে। খুঁটি দেয়ার কোনো প্রয়োজন পড়লো না। শিকড়গুলোকে কড়ি হিসেবে ধরে লম্বা আর মোটা বাঁশগুলো একটু ফাঁক ফাঁক করে সাজিয়ে দিলাম তার ওপর। হালকা আর ছোট বাঁশগুলো আবার গায়ে গায়ে লাগিয়ে সাজিয়ে দিলাম সেগুলোর ওপর। ছাদের কাঠামো তৈরি হলো। এবার বাঁশের মাঝের ফাঁক-ফোকর বন্ধ করার জন্য মাটির সঙ্গে ঘাস-পাতা আর পানি মিশিয়ে কাদা করে সেই কাদা পুরু করে লেপে দিলাম কাঠামোর ওপর। কাদার স্তর শুকানোর পর তার ওপরে ছড়িয়ে দিলাম জাহাজ থেকে আনা আলকাতরা। ছাদের নিচে চারপাশ ঘিরে দিলাম বাঁশের বেড়া দিয়ে। হয়ে গেল আস্তাবল। এখন আমাদের যে ক'টা চারপেয়ে জন্তু আছে তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেলেও এঁটে যাবে এই আস্তাবলে।

এরপর তৈরি করলাম বিরাট একটা হাঁস-মুরগির ঘর। তক্তার দেয়ালের ওপর আস্তাবলের মতোই বাঁশের চাল দেয়া হলো। তার ওপর মাটি আর আলকাতরার স্তর। কয়েক দিন লাগলো পাখিগুলোকে তাদের ঘর চেনাতে। এরপর চারপেয়েদের পায়ে চাপা পড়ে দু'পেয়েদের বাচ্চা মারা পড়ার কোনো ভয় আর রইলো না।

আবহাওয়া বদলাতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। ক'দিন আগেও দিনগুলো ছিলো রৌদ্রকরোজ্জ্বল, উষ্ণ। এখন ক্রমশ হয়ে উঠছে মেঘলা। উষ্ণতার কোনো ঠিক নেই, এই ঠাণ্ডা এই গরম। বুঝতে পারছি বর্ষা আসছে। আস্তাবলের সঙ্গেই একটা বড় গুদাম তৈরি করে, ভিজে নষ্ট হওয়ার মতো জিনিসপত্র সব এনে ঢোকালাম তার ভেতর।

কোনো রকম প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়েই এসে পড়লো বর্ষা। ভয়ানক বিপদে

লে দিলো আমাদের। গাছের ওপরের ঘরে আর থাকা সম্ভব নয়। সামান্য
তেই পালের কাপড়ের চাল চুইয়ে পানি পড়ে। তার ওপর আছে প্রচণ্ড বাতাস।
মাটি থেকে অত উঁচুতে বলেই বোধ হয় বাতাস আরো বেশি করে লাগে।
মা জানোয়ারগুলোর সাথে আস্তাবলে আশ্রয় নিতে হলো আমাদের। গরু, গাধা,
লের সাথে একই ছাদের নিচে গাদাগাদি করে থাকা যে কি ভয়ানক ব্যাপার তা
না থেকেছে তার পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব। জানোয়ারগুলোর গায়ের গন্ধ তো
ছই তার ওপর রয়েছে তাদের মল-মূত্রের গন্ধ। আগুন জ্বাললেই ধোঁয়ায় দম
হয়ে আসে। দুর্গন্ধ বা ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে যে বাইরে যাবো তা-ও
ব হয় না প্রবল বর্ষণের কারণে। একেবারে অসহ্য একটা অবস্থা।

বর্ষা শুরু হওয়ার কয়েকদিনের ভেতর বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে গেল
লকনস নেস্ট। নতুন একটা আস্তানা তৈরি করবো সে উপায়ও নেই। প্রায়
চদিনই বৃষ্টি হয়, এবং মুষলধারে, কখনো কখনো একটানা চার-পাঁচদিন।
গুর ভেতরের সিঁড়িঘরটা আস্তাবলের চেয়ে অনেক আরামের। কিন্তু সমস্যা
া ওখানে আমাদের সবার একসাথে জায়গা হয় না। আমার স্ত্রী অবশ্য দিনের
ণর ভাগ সময় ওখানেই কাটায়। উপরের দিকে কোনো এক জানালার পাশে
ড়র ধাপে বসে আমাদের জন্যে কাপড় সেলাই বা অন্য কিছু করে।

এদিকে শুকনো কাঠের মওজুদ খুব কমে এসেছে আমাদের। নতুন করে কাঠ
াহ করে যে রোদে শুকিয়ে নেবো তা-ও সম্ভব হচ্ছে না রোদ নেই বলে।
নো কখনো পুরো সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টার জন্যেও সূর্যের দেখা পাওয়া যায় না।
া রান্না ছাড়া আর কোনো কাজে আগুন জ্বালাই না আমরা। ভাগ্য ভালো,
াহাওয়া ভেজা হলেও ঠাণ্ডা খুব বেশি নয়।

যত দিন যাচ্ছে শুকনো কাঠের পরিমাণ ততই কমে আসছে, সেই সাথে কমে
াছে আমাদের রান্না করা গরম খাবার খাওয়ার হার। কয়েকদিন পর পর যখন
ার স্ত্রী একটা হাঁস বা মুরগি রান্না করে তখন আমাদের ভেতর রীতিমতো
নবের আমেজ লাগে।

এত সব সত্ত্বেও খুব যে দুঃখে কাটছে দিন তা কিন্তু নয়। ঘরে বসে থাকলেও
জর কামাই নেই। আসলে কাজ করতে চাইলে কাজের অভাব হয় না।
্যাবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আর জন্তুগুলোর পরিচর্যাতেই চলে যায় দিনের
একটা অংশ।

দিন অনেক ছোট হয়ে এসেছে আজকাল। চারটের ভেতর সন্ধ্যা হয়ে যায়।
্য ভালো, প্রচুর মোমবাতি আছে আমাদের। সন্ধ্যার পর মোমবাতি জ্বেলে
াল ঘিরে বসি সবাই। গল্পগুজব, অথবা লেখাপড়া, নয়তো টুকটাক হাতের
া করি তখন। খাওয়া দাওয়ার পর শোয়ার আগ পর্যন্ত বসে বসে সেলাই করে
াজাবেথ। আমি দ্বীপে আসার পর থেকে আমাদের জীবন কেমন করে চলছে,
কঠিন কঠিন কাজ সব করেছি, কি করে আমরা পরিপূর্ণ স্বাবলম্বী মানুষ হয়ে
ছি তার বিবরণ লিখছি। ফ্রিৎস আর জ্যাক দ্বীপে যে সব জন্তু আর গাছপালা
খছে তার ছবি আঁকে। এ ছাড়াও আমরা সবাই মিলে ছোট্ট ফ্রান্সিসকে লিখতে,
তে শেখাই। সব শেষে পবিত্র বাইবেল থেকে কিছু প্রার্থনা বাক্য পাঠ করে

BanglaBook.org

শুতে যাই।

ইতিমধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, আগামী বর্ষার আগেই একটা ন বাড়ি তৈরি করবো। তাছাড়া সামনে শীত আসছে, শীতের ঠাণ্ডা থেকে বাঁ জন্যেও কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। বর্ষার কষ্ট যাহোক সহ্য করা যাচ্ছে– নেই বলেই তা সম্ভব হচ্ছে, কিন্তু শীতের ধকল কিছুতেই সামলানো যাবে না। তিন ছেলে আর আমাকে নিয়ে তত চিন্তা নেই। এলিজাবেথ আর ফ্রান্সিস নিয়েই ভয়।

বিধ্বস্ত জাহাজ থেকে যেসব দরকারী জিনিস এনেছি তার ভেতর আছে বাক্স বই। ওগুলো থাকায় সন্ধ্যাগুলো অনেক আনন্দে কাটে। আমাদের সবে প্রিয় বই *রবিনসন ক্রুসো*। বার বার আমরা বইটা পড়ি। এরই ভেতরে কতবার পড়া হয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। আমি বা ছেলেদের কেউ জোরে জে পড়ি, বাকি সবাই শোনে। প্রতিবারই পড়ে বা শুনে মনে হয় রবিনসনের ক অনেক কিছু শেখার আছে আমাদের। আমাদের মতো সে-ও জাহাজ ডুবির এক দ্বীপে উঠেছিলো। তবে হ্যাঁ, একদিক থেকে আমরা তার চেয়ে ভাগ্যব আমরা রবিনসনের মতো নিঃসঙ্গ নই। শুধু এই একটা কারণেই কতবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছি, কি বলবো।

আমাদের বর্ষা-নিবাস কোথায় বানাতে হবে তা-ও বলে দিলো এই রবিন ক্রুসো। ঠিক করলাম, বৃষ্টিবাদল একটু কমলেই উপযুক্ত একটা গুহার খোঁ বেরোতে হবে।

BanglaBook.org

আঠারো

বর্ষার মেঘলা দিনগুলোর পর যখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠলো তখন কি খুশি হলাম তা বলে বোঝাতে পারবো না। সূর্য তার উজ্জ্বল রশ্মি ছড়িয়ে দি পৃথিবীর বুকে। ঝড়ো বাতাসের দাপট থেমে গেছে! মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে এখ আনন্দে চিৎকার করে আমরা বেরিয়ে এলাম মুক্ত আকাশের নিচে। ছেলে ফুর্তি দেখে কে! আবার ওরা লাফালাফি, ছুটোছুটি করতে পারবে; হাত পা গুটি ঘরে বসে থাকতে হবে না এই খুশিতে অস্থির সবাই।

মাথার ওপর নীল আকাশ। পাখির দল কূজন করছে। বর্ষার আগে যে বীজ বুনেছিলাম সেগুলো এখন কচি, তরতাজা গাছ। যেদিকে তাকাই সেদি ফুলের সমারোহ। বুনো ঝোপ-ঝাড়, এমন কি ঘাসের ডগায় পর্যন্ত ফুটে আছে বেরঙের ফুল। এ সব দেখে আমরা ভুলে গেলাম বর্ষার জঘন্য তিনটি মা কথা। মনে হলো ঈশ্বর চাইলে জীবনের বাকি দিনগুলো এই অপূর্ব সুন্দর জায় কাটিয়ে দিতে কোনো অসুবিধা হবে না আমাদের।

বর্ষা বিদায় নিতেই আমরা সাফ-সুতরো করে মেরামত করলাম আমা গাছের ওপরের ঘরটাকে। পালের কাপড়ের চাল ছিঁড়ে গেছে জায়গায় জায়গা

ধুলো-কাদা, মরা পাতা আর ডালে ভরে আছে ঘর। সব পরিষ্কার করে নতুন একটা চাল লাগাতে বেশ কয়েকদিন লাগলো। পাটাতন আর দেয়ালের টুকটাক মেরামত কাজও শেষ হলো। তারপর আবার আমরা ফ্যালকনস নেস্ট-এ গিয়ে উঠলাম।

এরপর টেন্ট হাউসের পথে রওনা হলাম আমাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে এখানকার অবস্থা কি হয়েছে দেখতে। কিন্তু ওখানে পৌঁছে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। ধারণা করছিলাম, খুব একটা সুবিধার দেখবো না ওখানকার অবস্থা, কিন্তু এত শোচনীয় দেখবো তা-ও ভাবিনি। সব লণ্ড-ভণ্ড হয়ে আছে। তাঁবুটা উড়ে গিয়ে পড়ে আছে এক ধারে। পুরু কাদার স্তর জমে গেছে তার ওপর। মালপত্র সব ভিজে একসা। ভালো মতো পরীক্ষা করে মনে হলো কিছু জিনিস রোদে শুকিয়ে নিলে আবার ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে। কিছু জিনিস পুরোপুরি না হলেও কিছুটা কাজ চালানোর মতো হবে। আর কিছু জিনিস সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। সবচেয়ে দুঃখ লাগলো, যখন দেখলাম, দুই পিপে বারুদ নষ্ট হয়েছে। পিপে কেটে বানানো আমাদের প্রথম নৌকাটা বাতাসের ঝাপটায় এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে ওটাকে আর কোনো কাজে লাগানো যাবে না। তবু ধরাধরি করে আমরা ডাঙায় তুলে রাখলাম নৌকাটা–কাঠগুলো হয়তো কখনো দরকার লাগবে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পানসি জাহাজ এলিজাবেথ-এর কোনো ক্ষতিই প্রায় হয়নি।

সত্যি কথা বলতে কি, একমাত্র পানসিটা ছাড়া আর কিছুই আমরা অক্ষত পেলাম না। ধ্বংসের পরিমাণ স্বচক্ষে দেখার পর মনে মনে বললাম, 'আর না। এমন করে কিছুতেই আর নষ্ট হতে দেয়া যায় না মূল্যবান জিনিসপত্র। পরবর্তী বর্ষার আগেই এমন একটা বাসস্থান আমাদের তৈরি করতে হবে যেখানে শুধু আমরাই না আমাদের মালপত্র আর জন্তু জানোয়ারগুলোও নিরাপদে এবং আরামে থাকবে।'

রবিনসন ক্রুসোর অনুসরণে গুহা তৈরির কথা ভেবেছি আগেই। কিন্তু এখন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে বুঝতে পারছি তত সহজ নয় কাজটা। রবিনসন ক্রুসো প্রায় তৈরি একটা গুহা পেয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আমরা পাবো কোথায়? এখানকার পাহাড়গুলোয় গুহা নেই বললেই চলে। যা আছে তা-ও এত ছোট যে তাতে জিনিসপত্র সহ আমরা সবাই তো দূরের কথা একা পিচ্চি ফ্রান্সিসও আঁটবে না। সেই গুহাগুলো আবার এমন জায়গায় যে সেগুলোর একটা বড় করে খুঁড়ে নেবো তা-ও সম্ভব নয়। সমাধান একটাই, নিরেট পাথর কেটে আমাদের প্রয়োজন মতো একটা গুহা তৈরি করে নিতে হবে। কিন্তু আমি হিসেব করে দেখলাম, সেজন্যে কমপক্ষে তিনটে শুকনো ঋতু প্রয়োজন। অর্থাৎ আগামী বর্ষা তো বটেই তার পরের বর্ষাও আস্তাবলেই কাটাতে হবে আমাদের।

কথাটা বললাম ছেলেদের। শুনে একটু চিন্তিত হলো ওরাও।

'লাগুক তিন বছর,' অবশেষে বললো ফ্রিৎস। 'তবু গুহা আমাদের তৈরি করতে হবে। না হয় করলামই কষ্ট আরো দুটো বছর। আপাতত বারুদগুলো নিরাপদে রাখার মতো একটা গুহা বানাতে পারলেই চলবে।'

আমরা মেনে নিলাম ওর কথা। আসলে তাছাড়া আর কিছু করারও নেই

BanglaBook.org

আমাদের।

অবশেষে একদিন সকালে আমি, ফ্রিৎস আর জ্যাক রওনা হলাম গুহা তৈ করার মতো পাহাড়ের সন্ধানে। আর্নেস্ট রইলো মা আর ছোট ভাইয়ের কাছে দিনে দিনে যদি পছন্দমতো জায়গা পেয়ে যাই তাহলে আজই শুরু করবো খোঁজ কাজ। তাই সঙ্গে নিয়েছি গাঁইতি, কুড়াল, শাবল, ছেনী আর হাতুড়ি। মোষটা পিঠে ওগুলো চাপিয়ে হেঁটে চলেছি আমরা।

টেন্ট হাউসের কাছের পাহাড়গুলোয় খোঁজ করতেই পছন্দমতো এক জায়গা পেয়ে গেলাম। প্রায় খাড়া গাওয়ালা একটা পাহাড়। দু'একবার গাঁই চালিয়ে বুঝলাম এখানকার পাথর অন্য পাহাড়গুলোর চেয়ে কম শক্ত। জায়গা চমৎকার। এখান থেকে সামনে তাকালে পুরো সেফটি বে দেখা যায়, ঘাড়টা এব ঘোরালেই চোখে পড়ে জ্যাক্‌ল রিভার আর ফ্যামিলি ব্রিজ।

গুহা মুখটা কত বড় হবে তা চিহ্নিত করলাম কয়লা দিয়ে দাগ টেনে তারপর শুরু হলো গাঁইতি চালানো। কিছুক্ষণের ভেতর ঘেমে নেয়ে উঠলা তিনজন। সূর্য যখন মাথার ওপর উঠলো তখন একটু বসলাম আমরা। দুপুরে খাওয়া সেরে নিলাম সঙ্গে আনা খাবার দিয়ে। তারপর আবার শুরু হলো গাঁইতি শাবল চালানো। সন্ধ্যার সময় যখন হিসেব করতে বসলাম কতটুকু কাজ হয়েছে তখন লজ্জা পেলাম মনে মনে। মাত্র এতটুকু! ভয়-ও পেলাম। এক দিনের কা দেখেই বুঝতে পারছি, পুরো গুহাটা খুঁড়তে কতদিন লাগবে। তিন বছরেও হবে কিনা সন্দেহ!

এই সন্দেহ সত্ত্বেও পরদিন আবার এলাম। এদিন কিছুটা কাজ করার প আশাব্যঞ্জক একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম। যতই আমরা খুঁড়তে খুঁড়তে পাহাড়ে ভেতর দিকে যাচ্ছি ততই ক্রমশ নরম হচ্ছে পাথর। ধারণা করলাম, সূর্যে উত্তাপে বাইরের দিকের পাথর শক্ত হয়েছে বেশি, ভেতর দিকে উত্তাপ ক লেগেছে বলে শক্তও কম। নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কাজ শুরু করলাম আমরা বিকেলের দিকে আমার ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হলো। আরো নরম হয়েছে পাথর। দ্বিগুণ উৎসাহে গাঁইতি চললো আমাদের।

ধীরে ধীরে এগোচ্ছে কাজ। এখন আর পাথর তত শক্ত নয় বলে পরিশ্র হচ্ছে কম। কয়েক দিন পর মেপে দেখলাম সাত ফুট মতো গর্ত করতে পেরে পাহাড়ের ভেতর। ফ্রিৎস ছোট্ট একটা একচাকা ঠেলা গাড়িতে করে পাথরে টুকরো নিয়ে যাচ্ছে বাইরে। আমি খুঁড়ছি গুহার ওপর দিকটা। জ্যাক নিচে অংশ–ছেনীর ওপর হাতুড়ি পিটিয়ে পিটিয়ে খসিয়ে আনছে পাথর।

'বাবা!' হঠাৎ ও চিৎকার করে উঠলো, 'পুরো ঢুকে গেছে ছেনীটা!'

'হা-হা! জ্যাক, কোথায় ঢুকে গেছে? পাহাড়ে? তোমার হাতে বা পায়ে ন তো?'

'না, না, হাতে পায়ে না, পাহাড়ে! হো-হো, পাহাড় ফুটো করে ফেলেছি ফ্রিৎস, আমি পাহাড় ফুটো করে ফেলেছি!'

ছুটে এলো ফ্রিৎস।

'কই দেখি?'

আমরা দুজনেই দেখলাম, সত্যিই জ্যাকের দীর্ঘ ছেনীটা পুরো ঢুকে গেছে পাহাড়ের ভেতর। ব্যাপার কি? হঠাৎ করে জ্যাকের গায়ে দানবের শক্তি এসে গেছে? নাকি যেখানে ও শাবল ঢুকিয়েছে তার ওপাশটা ফাঁপা?

একটা শাবল দিয়ে আমিও দু তিনটে ঘা মারলাম। জ্যাকের ছেনীর আঘাতে তৈরি হওয়া গর্তটা একটু বড় হলো। উঁকি দিলাম। বিশেষ কিছু দেখতে পেলাম না। তবে বুঝলাম ওপাশটা সত্যিই ফাঁপা। পাহাড়ের ভেতর একটা প্রাকৃতিক গুহা!

দু'ভাই এবার গাঁইতি তুলে নিলো। বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে দেয়ালটার ওপর–বাধা দিলাম আমি।

'সরে এসো! সরে এসো!' চিৎকার করলাম। 'ভেতরের বাতাস বিষাক্ত হতে পারে।' থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো দু'জন। পিছিয়ে এলো কয়েক পা। 'পরীক্ষা করে দেখি সত্যিই ওখানকার বাতাস বিষাক্ত কিনা। যাও, কিছু শুকনো ঘাস পাতা জোগাড় করে আনো। আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে দেবো ভেতরে। আগুন যদি ঠিক মতো জ্বলে তাহলে বুঝতে হবে ঠিকই আছে বাতাস।'

ছুটে গিয়ে দু'ভাই শুকনো ঘাস নিয়ে এলো। এক গোছা ঘাস নিয়ে আগুন জ্বাললাম আমি। জ্বলন্ত ঘাস ছুঁড়ে দিলাম গুহার ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল আগুন। কুঁচকে উঠলো দু'ভাইয়ের ভুরু।

'সত্যিই তো, বাতাস বিষাক্ত ওখানে!'

'কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখি, বাইরের বাতাস ঢুকলে বোধহয় ঠিক হয়ে যাবে।'

প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম আমরা। বিশ্রাম নেয়া তো হলোই, সেই সাথে দুপুরের খাওয়াও সেরে নেওয়া গেল। তারপর আবার কিছু শুকনো ঘাসে আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে দিলাম গুহার ভেতর। এবার দেখা গেল শান্তভাবে জ্বলছে ঘাসগুলো। এখন আর ভেতরের বাতাস দূষিত নেই। তবু এক্ষুণি ওই গুহার ভেতর ঢোকার ইচ্ছে হলো না আমার। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে চাই।

গুহাটা আবিষ্কার করতে পেরে খুব খুশি আমরা। কপাল ভালো হলে আগামী বর্ষার আগেই সব লটবহর নিয়ে এখানে চলে আসা যাবে। ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরলাম জ্যাকের দিকে।

'এক্ষুণি ফ্যালকনস নেস্টে চলে যাও,' বললাম আমি। 'তোমার মাকে খবরটা জানাবে না? আর হ্যাঁ, ফেরার সময় নিয়ে এসো ওকে। নিজের চোখে দেখে যাক আমাদের–মানে, তোমার আবিষ্কার। সঙ্গে করে কিছু মোমবাতিও এনো।'

উঠে দাঁড়ালো জ্যাক। এক লাফে মোষের পিঠে চড়ে পূর্ণ বেগে মোষ ছোটালো ফ্যালকনস নেস্টের দিকে। আমি আর ফ্রিৎস লাগলাম দেয়ালের গর্তটাকে বড় করার কাজে, যেন সবাই এলে ঢোকা যায় গুহার ভেতর।

ঘণ্টা চারেক পর পরিবারের আর সবাইকে নিয়ে ফিরে এলো জ্যাক। আর্নেস্ট, ফ্রান্সিস আর এলিজাবেথ টানা গাড়িতে বসে। লাইটফুট আর গরুটা টানছে গাড়ি। সামনে মোষের পিঠে শিঙা বাজাচ্ছে জ্যাক।

BanglaBook.org

উনিশ

গুহায় ঢোকার জন্যে প্রস্তুত আমরা। প্রত্যেকে একটা করে মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়েছি। রোমাঞ্চকর কোনো ঘটনার মুখোমুখি হতে যাচ্ছি এমন ভঙ্গিতে সবার দিকে তাকালাম আমি। বললাম, 'চলো তাহলে, ঢোকা যাক আমাদের গুহায়!'

আমিই ঢুকলাম প্রথমে। ছেলেরা এলো আমার পরে। একেবারে শেষে ওদের মা। কৌতূহলে টগবগ করছে সবাই। একটু ভয় ভয়-ও লাগছে। এমন কি কুকুরগুলো পর্যন্ত, যারা সব সময় আগে আগে ছোটে, আজ রয়েছে পেছনে; এলিজাবেথের পাশে।

মাত্র তিন কদম গিয়েছি কি যাইনি, বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা। নিজেদের অজান্তেই জমে গেছি যেন। এ কোথায় এসেছি? এ কি কোনো গুহা না পরীর রাজ্য? গুহার দেয়ালগুলো হীরার মতো ঝকমক করছে। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে অনেকগুলো অমসৃণ পাথুরে থাম। রঙধনুর রঙ ঠিকরে বেরুচ্ছে সেগুলো থেকে। ছাদ থেকে ঝুলছে নানা আকারের অসংখ্য স্ফটিক। মোমের মৃদু আলো সেগুলোর ওপর পড়ে পরিণত হচ্ছে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, কমলা, বেগুনী এবং আরো অনেক রঙের দ্যুতিতে।

সম্বিত ফিরলো আমার। এগোতে শুরু করলাম আবার। রঙধনুর রঙ-ও এগোলো সাথে। মুখ দিয়ে কথা সরছে না কারো! মনে হচ্ছে, অপূর্ব কোনো স্বপ্ন দেখছি যেন।

কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ জানি না, পুরোপুরি সচেতন হলাম আমি। মনে পড়লো, কোথায়, কেন এসেছি। এবার ভালো করে তাকালাম গুহার চারপাশে– ঝকমকে দ্যুতি নয়; গুহাটা কেমন, বাসযোগ্য কিনা তা দেখবার জন্যে।

গুহার মেঝে সমতল। দেয়ালগুলো সাদা বেলে পাথরের মতো এক ধরনের পাথর দিয়ে তৈরি। একটা স্ফটিক ভেঙে নিলাম আমি। মুখের কাছে নিয়ে সাবধানে জিভ ছোঁয়ালাম। নোনতা! অন্য দিকের আরেকটা স্ফটিক নিয়ে স্বাদ পরীক্ষা করলাম। সন্দেহ নেই আর, পাথুরে লবণে তৈরি গুহা। যাক, বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ লবণেরও আর কোনো অভাব থাকবে না আমাদের।

গুহার আরো ভেতর দিকে এগিয়ে গেলাম। যত এগোচ্ছি ততই বিস্ময় বাড়ছে। আরো নতুন নতুন আকারের স্ফটিক দেখতে পাচ্ছি দেয়ালে, ছাদে। আগেরগুলোর মতোই উজ্জ্বলভাবে আলো প্রতিফলিত করছে। কিছুক্ষণের ভেতর বুঝে ফেললাম আমাদের যতটুকু দরকার তার চেয়ে অনেক বড় গুহাটা। দূরের অনেক কোনায় ঠিক মতো পৌঁছুচ্ছে না মোমের আলো। এলিজাবেথ আর ছোট তিন ছেলেকে গুহামুখের কাছে চলে যেতে বলে আমি আর ফ্রিৎস আরো ভালো করে পরীক্ষা করলাম গুহাটা। সবগুলো কোনায় সতর্কভাবে চোখ বুলালাম। ভীতিজনক কিছু নজরে পড়লো না। গাড়ি থেকে লম্বা লাঠি এনে দেয়ালে, ছাদে

BanglaBook.org

ঠুকে ঠুকে দেখলাম। অবশেষে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, সত্যিই ভয়ের কিছু নেই এখানে।

এবার আলাপ আলোচনা শুরু হলো আমাদের ভেতর, আবাস হিসেবে গুহাটাকে সাজানো হবে কিভাবে। ছেলেরা তো এই মুহূর্তে এখানে চলে আসতে চায়। অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত করলাম ওদের। সিদ্ধান্ত হলো, এ বছরটা অর্থাৎ আগামী বর্ষার আগ পর্যন্ত ফ্যালকনস নেস্টেই কাটাবো আমরা। এই ফাঁকে জিনিসপত্র এনে সাজিয়ে গুছিয়ে বাসযোগ্য করে তোলা হবে গুহাটাকে। রাতে খাওয়ার সময় অনেক তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হলো গুহাটার নাম হবে *রক ক্যাস্‌ল*।

পরদিন থেকে শুরু হলো কাজের নতুন পর্যায়। প্রথমেই পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা গর্ত করলাম আলো বাতাসের জন্যে। জাহাজ থেকে আনা জানালাগুলো লাগিয়ে দিলাম এসব গর্তের মুখে। ফ্যালকনস নেস্টের সিঁড়িঘরে এগুলোর আর প্রয়োজন নেই। বিরাট দরজাটা লাগানো হলো মূল গুহামুখে।

আলো বাতাসের ব্যবস্থা হলো। দরজা লাগানোতে নিরাপত্তার ব্যবস্থাও কিছুটা হলো। এবার পরবর্তী কাজ। বিশাল গুহাটাকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেললাম। এক দিকে আমাদের থাকার জায়গা। অন্য দিকে রান্নাঘর, আস্তাবল আর ভাঁড়ার ঘর, গুদাম।

আমাদের থাকার জায়গাটাকে আবার ভাগ করা হলো আরো কয়েকটা ভাগে। প্রত্যেকটা ভাগকেই কামরার চেহারা দিলাম কাঠ, খুঁটি, আর পাথরের সাহায্যে। দুটো শোয়ার কামরা—একটা আমার আর এলিজাবেথের, অন্যটা ছেলেদের; একটা বসার কামরা আর একটা খাওয়ার ঘর।

কামরাগুলো তৈরি করার সময় খেয়াল রাখলাম, শোয়ার ঘরগুলোয় যেন জানালা থাকে। রান্নাঘরে আগুন জ্বলবে, সুতরাং সেখানেও একটা জানালা রাখতে হলো। সুন্দর এবং অনেক কাজের উপযোগী করে একটা চুলা তৈরি করলাম রান্নাঘরে। রান্নাঘরের পাশেই খানিকটা জায়গা ফাঁকা রয়ে গেল। ঠিক করলাম কাজের ঘর হিসেবে ব্যবহার করবো জায়গাটাকে। ছুতোর মিস্ত্রীর এবং অন্যান্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি এনে রাখলাম সেখানে।

আস্তাবলটাকেও সুন্দর করে তৈরি করা হলো। গরু, গাধা, মোষ, ছাগল, ভেড়া—প্রত্যেক ধরনের জন্তুর জন্যে আলাদা আলাদা থাকার জায়গা। হাঁস-মুরগির জন্যেও আলাদা ঘর। অবশেষে শেষ হলো রক ক্যাসল সাজানোর কাজ।

সন্দেহ নেই কঠোর পরিশ্রম আর দীর্ঘ সময় লাগলো এসব করতে। তবে খুশি মনেই আমরা করলাম। কারণ, নিজেদের আরামের জন্যেই এসব করছি আমরা। গত বর্ষার কষ্টের কথা যখনই মনে পড়েছে তখনই নতুন উদ্দীপনা অনুভব করেছি অন্তরে। কাজ শেষ করে সত্যিই তৃপ্তিতে ভরে গেল হৃদয়। বার বার কেবল মনে হতে লাগলো ঈশ্বরের করুণার কথা। গত বর্ষা কাটিয়েছি আস্তাবলে আর আগামী বর্ষা কাটাবো রূপকথার রাজপুরীতে।

দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির পর ফ্যালকনস নেস্টে ফিরলাম। আবহাওয়া চমৎকার

BanglaBook.org

এখন। এবার আমাদের সবজি বাগানটার একটু তদারকী করতে হয়। বর্ষার আগে যেসব তরিতরকারির বীজ-চারা লাগিয়েছিলাম সেগুলো এখন পুরোদস্তুর গাছ। অনেক গাছেই ফল এসেছে। সেগুলোর মধ্যে আছে আনারস আর তরমুজ। খুব শিগগিরই পাকতে শুরু করবে ফল।

ছোট্ট একখণ্ড জমিতে গম এবং ভুট্টা লাগিয়েছিলাম। ওগুলোতেও ফল ধরেছে। আনন্দের বিষয় হচ্ছে ফলন খুব ভালো। বীজ রাখার পরও হাতে যে পরিমাণ ফসল থাকবে তাতে আমাদের খাবারের চাহিদার অনেকখানি মিটে যাবে। ঠিক করলাম আগামী মৌসুমে আরো বড় জমিতে গম লাগাবো। তাতে খাবারের জন্যে আর বনে বাদাড়ে ঘুরতে হবে না।

আমাদের পোষা পশুপাখির সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি হাঁস-মুরগি আর ছাগল-ভেড়ার পরিমাণ এত বেড়েছে যে ওদের খাওয়ানো-ই এক বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। আর কিছুদিন যদি ওদের সঙ্গে রাখি তাহলে আমাদেরই খাবারের টানাটানি পড়ে যাবে। প্রতি সপ্তাহেই দু'তিনটে করে হাঁস বা মুরগি খাচ্ছি; ডিম তো খাচ্ছিই প্রত্যেকে দিনে একটা করে, তবু খুব দ্রুত বেড়ে চলেছে হাঁস-মুরগির সংখ্যা। এই অবস্থায় ঠিক করেছি, যেগুলো অতিরিক্ত হয়ে গেছে সেগুলোকে খাবারের অসুবিধা নেই এমন একটা জায়গা দেখে ছেড়ে দিয়ে আসবো। নিজেরাই মনের আনন্দে খাবার খুঁজে খেতে পারবে।

ক'দিন পরেই এক কাকডাকা ভোরে আমরা রওনা হলাম জন্তুগুলোর উপনিবেশের সন্ধানে। এক ডজন মুরগি, দুটো মোরগ, চারটে ভেড়া আর এক জোড়া ছাগলে বোঝাই দিলাম টানা গাড়ি। আমরাও উঠে বসলাম গাড়িতে। গরু, মোষ আর আমাদের পুরনো গ্রিয়লকে লাগানো হলো গাড়ি টানার কাজে। ফ্রিৎস লাইটফুটের পিঠে চেপে চললো আগে আগে। এমন একটা জায়গার দিকে এগোচ্ছি যেখানে আগে কখনো যাইনি আমরা।

ধীর গতিতে চলছে গাড়ি। লম্বা ঘাস আর ঝোপঝাড় পথ জুড়ে আছে। তার ভেতর দিয়েই গাড়িটা টানিয়ে নিয়ে চলেছি। অবশেষে নিচু, ঝোপ ঝোপ মতো গাছপালায় ছাওয়া এক সমভূমিতে পৌঁছুলাম আমরা। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম ঝোপের মাথাগুলো সাদা এক রকম জিনিসে ভরে আছে, যেন সাদা তুষার জমেছে গাছের ওপর।

'তুষার! তুষার!' আনন্দে চিৎকার করে উঠলো পিচ্চি ফ্রান্সিস। আমরা কেউ বাধা দেয়ার আগেই লাফিয়ে নেমে গেল ও গাড়ি থেকে, তুষার নিয়ে খেলা করবে।

হেসে ফেললাম আমি। ওগুলো আর যা-ই হোক তুষার যে নয় তাতে সন্দেহ নেই। দিব্বি উষ্ণ আবহাওয়া, তুষার আসবে কোত্থেকে? একটু পরে আমিও নামলাম গাড়ি থেকে। কয়েক পা এগিয়ে একটা ঝোপ পরীক্ষা করেই বুঝতে পারলাম, তুষার নয় কার্পাস গাছের সন্ধান পেয়েছি আমরা। পুরো সমভূমিটা কার্পাস গাছে ভর্তি। তুষারের মতো সাদা সাদা জিনিসগুলো আর কিছু নয়, তুলা!

এত তুলা দেখে খুশি হয়ে উঠলো এলিজাবেথ।

'এখানে যা তুলো আছে,' বললো ও, 'এ থেকে যা সুতো হবে আর তা থেকে

BanglaBook.org

যা কাপড় হবে আমরা সবাই মিলে পরেও সারা জীবনে তা শেষ করতে পারবো না।' আমার দিকে ফিরলো ও। 'আমাকে একটা তাঁত বানিয়ে দিতে পারবে?'

'চেষ্টা করবো,' প্রতিশ্রুতি দিলাম আমি।

গাড়িতে যতগুলো খালি বস্তা ছিলো সবগুলোয় তুলা ভরে নিয়ে আবার এগোলাম। তুলার ঝোপগুলো শেষ হতেই শুরু হলো সবুজ প্রান্তর। মাঝে মাঝে ছোট ছোট সবুজ ঝোপ। জন্তুগুলোকে ছাড়ার জন্যে এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না। পানির কোনো অভাব হবে না। কাছেই একটা ঝর্ণা বয়ে চলেছে কুলকুল করে। আশ্রয়ের-ও অভাব হবে না। প্রান্তরের মাঝামাঝি জায়গায় মাথা তুলেছে ছ'টা বিশাল গাছ, যেটার ওপর আমরা ঘর বানিয়েছি প্রায় সেটার মতো। ঠিক করলাম গাছগুলোর আড়ালে ওদের জন্যে একটা ঘর বানিয়ে দিয়ে যাবো।

এদিকে সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। গাছগুলোর নিচে নিয়ে গেলাম গাড়ি। এখানেই রাত কাটাবো আজ। কাল ভোরে লাগবো ঘর তৈরির কাজে। সঙ্গে যা যা ছিলো তা দিয়েই রাতের খাবার সারলাম। ছোট একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে শুয়ে পড়লাম সবাই। টার্ক আর পনটো রইলো পাহারায়।

পরদিন ভোরে শুরু হলো ঘর বানানোর কাজ। গাছের ডাল, পাতা, বাকল ব্যবহার করে চল্লিশ ফুট লম্বা, ষোল ফুট চওড়া ঘরটার মূল কাঠামো তৈরি করে ফেললাম দুপুরের ভেতর। দুটো ভাগ রাখছি ঘরটায়। বড় অংশে থাকবে ছাগল আর ভেড়াগুলো। ছোট অংশ সংরক্ষিত থাকবে আমাদের জন্যে। মাঝে মাঝে যখন আমরা জন্তুগুলোর খোঁজ খবর করতে আসবো তখন থাকবো ওখানে। ঘরের যে অংশে ছাগল ভেড়ার থাকার জায়গা তার ওপর দিকে চালের ঠিক নিচে তৈরি করলাম খড় রাখার জায়গা। ঘরের এক প্রান্তে বানানো হলো মুরগির খোঁয়াড়।

ভেবেছিলাম দু'তিন দিনেই তৈরি করে ফেলতে পারবো ঘরটা। কিন্তু লাগলো পুরো এক সপ্তাহ। এ সময় খাবারের অভাব দেখা দিলো আমাদের। আর এক বেলা-ও ঠিক মতো চলবে কিনা সন্দেহ। জ্যাক আর ফ্রিৎসকে পাঠিয়ে দিলাম ফ্যালকনস নেস্টে, খাবার দাবার এবং আরো কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসার জন্যে।

ওরা চলে যাওয়ার পর আমি আর আর্নেস্ট এলাকাটা ভালো করে দেখতে বেরোলাম। একটু দূরে যে ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে সেটার তীর ধরে দূরের পাহাড়সারির দিকে এগোলাম। পাহাড়ের যেখান থেকে ঝর্ণা নেমে এসেছে সেখানে পৌঁছে পাহাড়ের গা বেয়ে সামান্য উঠতেই একটা ছোট্ট হ্রদ দেখলাম ওপাশে। হ্রদের পরে একটা জলাভূমি। তার ওপাশে সবুজ গাছের সারি। এপাশে হ্রদের নীল পানি ওপাশে নীল আকাশ। মাঝখানে সবুজ একটা রেখা। চমৎকার দৃশ্য। হ্রদের পাড় ঘেঁষে চলে গেলাম জলাভূমির কাছে। তারপর যা দেখলাম, সত্যিই অভাবনীয়। বুনো এক ধরনের ধান গাছে ভরে আছে জলা। পাকা ধানে সোনালী হয়ে আছে গাছগুলোর ডগা। আর সেই ধানের লোভে জলায় নেমেছে অসংখ্য চেনা অচেনা রঙ-বেরঙের পাখি। কালো এক ধরনের রাজহাঁস দেখলাম। বিরাট একেকটা। আমাদের সাড়া পেয়েই এক সাথে ডানা মেললো সবগুলো পাখি। ওদের ভীত কর্কশ আওয়াজে মুখর হয়ে উঠলো জায়গাটা। বন্দুক তুলে গুলি করলাম আমি। টুপ টুপ করে গোটা ছয়েক পাখি পড়লো জলায়। ছুটে গিয়ে আর্নেস্ট তুলে

আনলো সেগুলো।

আরো কিছুক্ষণ হ্রদের পাড়ে ঘোরাঘুরি করে ফিরে এলাম আমরা। এসে দেখি ফ্রিৎস আর জ্যাক ফিরে এসেছে খাবার নিয়ে। ওদের মা রান্নাও করে ফেলেছে। দেরি না করে খেতে বসে গেলাম। পরদিন সকালে ছাগল, ভেড়া আর মুরগিগুলোকে রেখে বাড়ির পথে রওনা হলাম আমরা।

আগেই ঠিক করেছিলাম ফ্যালকনস নেস্টে যাওয়ার আগে একবার কেপ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টে যাবো। কিছুদিন আগে ওখানে যে কুটিরটা বানিয়েছি সেটার একটু সংস্কার করা দরকার। আমাদের খাবার দাবারের বেশির ভাগই এখনো সংগ্রহ করা হয় কেপ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট থেকে। সুতরাং ওখানকার কুটিরটা মজবুত আর বাসযোগ্য থাকা দরকার। ফল পাকুড় সংগ্রহ করতে গিয়ে ঝড় বাদল এসে গেলে আশ্রয় নিতে পারবো।

দুপুর নাগাদ পৌঁছে গেলাম কেপ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টে। চরে বেড়ানোর জন্যে জন্তুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে কাজে নামলাম আমরা। সন্ধ্যা নাগাদ শেষ হয়ে গেল ঘরের কাজ। রাতে খাওয়ার সময় ফ্রিৎস বললো, 'কিছু আসবাবপত্র বানিয়ে রাখলে কেমন হয়? পরে যখন আসবো তখন অনেক আরামে কাটবে দিনগুলো।'

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। অতএব পরের আরো কয়েকটা দিন আমরা থেকে গেলাম কেপ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টে। ওখান থেকে যেদিন ফিরে আসবো তার আগের দিন সন্ধ্যায় আমাদের গরুটা কোত্থেকে যেন একটা এঁড়ে বাছুর জুটিয়ে আনলো। আমাদের আনন্দ আর দেখে কে? যে করেই হোক ওটাকে ধরতে হবে। তাহলে আশা করা যায় আগামী দিনগুলোতে বড় একটা গরুর পাল হবে আমাদের।

লাইট ফুটকে যে উপায়ে ধরেছিলাম সেভাবে ধরলাম এঁড়েটাকে। মোষটাকে যে ভাবে এনেছিলাম সেই একই উপায়ে তাকে নিয়ে এলাম ফ্যালকনস নেস্টে।

BanglaBook.org

বিশ

বাড়ি ফেরার ক'দিন পরেই আবার রক ক্যাস্‌ল-এ গেলাম আমরা। টুকটাক অসমাপ্ত কাজ শেষ করলাম। ফ্যালকনস নেস্ট থেকে টেবিল, চেয়ার, খাট এ ধরনের কিছু আসবাবপত্র নিয়ে গেলাম। নতুন করে বানাতে হলো কিছু আসবাবপত্র। জায়গা মতো সাজিয়ে ফেললাম সেগুলো। সব কাজ শেষ। এখন আমাদের গুহাবাড়িটার চেহারা এত চমৎকার হয়েছে যে আর এক দিনও অন্য জায়গায় থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না ছেলেদের। শুধু ছেলেদের কথা বলি কেন, ওদের বাবা মা-রও এক অবস্থা। মনে হচ্ছে আজই সব জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসি এখানে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসবো, ছেলেদের কথা দিলাম। এবং সত্যি সত্যি বর্ষার অনেক আগেই আমরা রক ক্যাস্‌ল-এ এসে উঠলাম।

দ্বীপে ওঠার পর এতদিনে সত্যিকার অর্থে একটু সভ্য জীবন যাপন করতে পারছি। সভ্য মানুষের প্রয়োজনীয় সব জিনিসই আছে আমাদের। তার ওপর আছে প্রচুর বই, এমন কি সঙ্গীতও। জ্যাক আর ফ্রান্সিস বাঁশি বানিয়েছে। ইতিমধ্যে ভালোই সুর তুলতে শিখে গেছে দু'জন। ওরা বাঁশি বাজায়, ওদের মা গান গায়। মোট কথা সভ্য দুনিয়া থেকে অনেক দূরে এই জনহীন দ্বীপে আনন্দেই কাটছে আমাদের দিন। কোনো দুঃখ নেই, ভাবনা-চিন্তা নেই।

একদিন সন্ধ্যায় প্রিয় পরিবারের সদস্যদের বললাম, 'কাল আমাদের ছুটি। দিনটা বিশেষ ভাবে উদযাপন করবো আমরা।'

অবাক চোখে তাকালো সবাই আমার দিকে। কাল রবিবার নয় তবু ছুটি, ব্যাপার কি? বললাম, 'কাল দ্বীপে ওঠার দ্বিতীয় বছর পূর্ণ হবে। আমাদের জন্যে একটা স্মরণীয় দিন।'

আশ্চর্য হয়ে গেল ওরা। কোন দিক দিয়ে দুটো আস্ত বছর পেরিয়ে গেছে কেউ টের পায়নি।

'সময় খুব দ্রুত পেরিয়ে গেল যেন,' বললো এলিজাবেথ। 'দুই দুটো বছর চলে গেল, অথচ মনে হয়, দুমাসও হয়নি আমরা এখানে এসেছি!'

'ব্যস্ত মানুষের সময় উড়ে চলে,' জবাব দিলাম আমি, 'আলসে লোকের সময় পেরোয় খুঁড়িয়ে।'

উত্তেজনায় টগবগ করতে করতে বিছানায় গেল ছেলেরা। দেখে কেন জানি না, আমার মনে হলো, অবাক করে দেয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটাবে ওরা কাল।

পরদিন ভোরেই ঘটলো ঘটনাটা। কামানের শব্দে ঘুম ভাঙলো আমার। ছুটে বেরিয়ে এলাম গুহার বাইরে। চার দস্যি তখন মিটিমিটি হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। সরু একটা ধোঁয়ার রেখা এখনো বেরিয়ে আসছে কামানের মুখ থেকে। এভাবে বারুদ অপচয় করার জন্যে বকা দিলাম ওদের। কিন্তু সত্যি সত্যি রাগ করতে পারলাম না। যত যাই হোক দিনটা আমাদের জন্যে কামান দেগে শুরু করার মতোই।

ঝটপট কাপড়চোপড় পরে তৈরি হলাম সবাই। আমাদের সেরা কাপড়গুলোই পরলাম। প্রথমেই দৈনিক উপাসনা। তারপর আমার দিনলিপির বিশেষ বিশেষ অংশ পড়ে শোনালাম, যাতে করে গত দু'বছরে যে সব ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে আমরা বেঁচে গেছি সেগুলো মনে পড়ে যায় ওদের। হাঁটু গেড়ে বসে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলাম।

দিনের বাকি সময় কাটলো খেলাধুলা আর নানারকম প্রতিযোগিতা করে।

প্রথমেই হলো গুলি ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা। ক্যাঙ্গারুর মতো দেখতে একটা লক্ষ্যবস্তু তৈরি করে বড় তিন ছেলেকে বললাম গুলি করতে। জ্যাক গুলি লাগালো লক্ষ্যবস্তুর কানে, ফ্রিৎস মাথায় আর আর্নেস্ট ঠিক মাঝ বরাবর।

এরপর হলো তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা। সব ক'জনই খুব ভালো করলো এতে। এমন কি পিচ্চি ফ্রান্সিসও।

তারপর দৌড় প্রতিযোগিতা।

'ফ্যালকন্‌স নেস্টে টেবিলের ওপর আমার ছুরিটা রয়েছে,' বললাম আমি।

BanglaBook.org

'যে আগে গিয়ে ওটা নিয়ে আসতে পারবে সে-ই জিতবে।'

রওনা হয়ে গেল বড় তিন ছেলে। কিছুক্ষণের ভেতর দেখলাম জ্যাক আর ফ্রিৎস বেশ এগিয়ে গেছে আর্নেস্টকে ছাড়িয়ে। তবে ও পেছনে পড়ে গেলেও অন্য দু'ভাইয়ের চেয়ে নিশ্চিত ভঙ্গিতে পা ফেলছে। একটু পরেই গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল তিনজন।

এক ঘণ্টা পর ফিরে এলো জ্যাক মোষের পিঠে চড়ে। পেছনে দড়ি বাঁধা অবস্থায় গাধা দুটো।

'উঁহুঁ, ঠিক কাজ করোনি তুমি,' ওকে বললাম। 'মোষের নয়, নিজের পাগুলো ব্যবহার করার কথা ছিলো তোমার।'

'জানি। কিন্তু যখন দেখলাম জেতার কোনো আশা নেই তখন বাদ দিলাম। পরের প্রতিযোগিতায় লাগবে ভেবে নিয়ে এলাম এগুলো।'

একটু পরেই এলো ফ্রিৎস। ক্লান্ত ঘর্মাক্ত চেহারা। ওর ঠিক পেছনেই এলো আর্নেস্ট। ও-ই নিয়ে এসেছে ছুরিটা।

'আশ্চর্য!' বললাম আমি, 'ফ্রিৎস আগে এলো অথচ, আর্নেস্ট, তোমার হাতে দেখছি ছুরি!'

'ওর আগেই আমি ফ্যালকন্‌স নেস্টে পৌঁছেছি,' ব্যাখ্যা করলো আর্নেস্ট। 'পরে ফেরার সময় ও আমার দৌড়ানোর কৌশল অনুকরণ করেছে, এবং সহজেই হারিয়ে দিয়েছে আমাকে। যত যা-ই হোক ওর বয়েস সতেরো আর আমার পনেরো।'

'তোমরা দু'জনেই ভালো করেছো,' বললাম আমি। বিজয়ী ঘোষণা করলাম আর্নেস্টকে।

এরপর আরেকটা প্রতিযোগিতা হলো। জ্যাক চড়লো মোষের পিঠে, ফ্রিৎস বুনো গাধাটা–মানে লাইটফুটের পিঠে আর আর্নেস্ট গ্রিয়ল-এর পিঠে। তিনজনই ভালো চালালো। তবে জ্যাককেই বিজয়ী ঘোষণা করতে হলো। কারণ, দেখলাম তিনজনের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে দক্ষ চালক। মোষটার পিঠে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে এমন সব কৌশল ও দেখালো যা সার্কাসের লোকরাই কেবল দেখাতে পারে বলে আমার ধারণা ছিলো এতদিন।

এঁড়ে বাছুরটার পিঠে–এতদিনে বেশ বড় হয়েছে ওটা–চড়ে এলো পিচ্চি ফ্রান্সিস। আমাদের সামনে এসে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো।

'ভদ্র মহিলা, ভদ্র মহোদয়গণ!' শুরু করলো ও, 'আমি কেমন চড়ি দেখবেন?'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালাম আমি আর এলিজাবেথ।

ফ্রান্সিস দেখালো সে কেমন চড়ে। বয়সের তুলনায় একটু বেশি পটু মনে হলো ওকে। আমার ধারণা, আর কয়েক বছরের ভেতর এ ব্যাপারে জ্যাককে ছাড়িয়ে যাবে ফ্রান্সিস।

এর পর গাছে চড়ার প্রতিযোগিতা এবং সাঁতার প্রতিযোগিতা হলো। সন্ধ্যার একটু আগে সব প্রতিযোগিতা শেষ করে রক ক্যাস্‌লে ফিরলাম আমরা। অনেকগুলো মোমবাতি জ্বালানো হলো। রূপকথার প্রাসাদের মতো ঝিকমিকিয়ে উঠলো স্ফটিকের গুহা। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে আমি প্রস্তাব করলাম, ওদের

BanglaBook.org

মা-কে *দিনের রাণী* হিসেবে ঘোষণা করতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে হুররে করে উঠলো ওরা।

ফুল দিয়ে সাজানো উঁচু একটা চেয়ারে আনুষ্ঠানিক ভাবে বসানো হলো রাণীকে। পুরস্কার আর আদর মাখা চুমু উপহার দিলো সে বিজয়ীদের। জাহাজ থেকে আনা সুন্দর কিছু জিনিস দেয়া হলো পুরস্কার হিসেবে।

গুলি ছোঁড়া এবং সাঁতার প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ফ্রিৎসকে দেয়া হলো একটা ইংলিশ বন্দুক আর হান্টিং নাইফ। আর্নেস্ট পেলো একটা সোনার ঘড়ি–জাহাজের ক্যাপ্টেনের সম্পত্তি ছিলো ওটা। জ্যাককে দেয়া হলো এক জোড়া বুট জুতা আর একটা চাবুক। সব শেষে পুরস্কার দেয়া হলো পিচ্চি ফ্রান্সিসকে। ও পেলো এক বাক্স রঙ।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দেয়ার পর আমি এলিজাবেথকে একটা সেলাইয়ের বাক্স উপহার দিলাম।

'এটা হলো তোমার ধৈর্য আর কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার,' বললাম আমি। 'কিন্তু এ তো একটা প্রতীক মাত্র। তোমার আসল পুরস্কার লুকিয়ে আছে আমাদের অন্তরে–দুনিয়ার সেরা স্ত্রী ও মা-র জন্যে তার স্বামী ও সন্তানদের ভালোবাসা।'

রাতে গান হলো। জ্যাক আর আর্নেস্টের বাঁশির সুরে গাইলো এলিজাবেথ। তারপর চললো মজার মজার গল্প। অবশেষে চমৎকার এক ভোজের ভেতর দিয়ে শেষ হলো ছুটির দিনটা।

BanglaBook.org

একুশ

দ্বীপে ছোট্ট এক ধরনের পাখি প্রচুর পরিমাণে আছে। ছোট হলেও খেতে খুব ভালো। বর্ষার সময় দীর্ঘ তিনটে মাস হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। শিকারে বেরোতে পারবো না। তখন যেন খাবার–বিশেষ করে আমিষের অভাবে না পড়তে হয় সে জন্যে কিছু পাখি সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এলিজাবেথ ওগুলো সংরক্ষণ করার সহজ একটা পদ্ধতি বের করেছে ক'দিন আগে। মাখনের পিপেতে চামড়া ছাড়িয়ে রেখে দিলে অনেক দিন ঠিক থাকে ঐ পাখির মাংস। ঠিক করেছি ওগুলো মারতে গুলি বারুদ খরচ করবো না। একেকবার গুলি করে যদি একটা দুটো পাখি মারি–চারটেও যদি মারি, খরচে পোষাবে না। তাই অনেক ভেবে একটা বুদ্ধি বের করেছি। রাবার গাছের কাঁচা কষ খুবই আঠালো জিনিস। দ্বীপের যেখানে পাখির সংখ্যা বেশি সেখানে গাছের ডালে লাগিয়ে রাখবো ঐ আঠা। বসলেই আটকে যাবে।

ছেলেদের পাঠিয়ে আনালাম রাবার গাছের কষ। তারপর নিজে গিয়ে অনেকগুলো গাছের ডালে তা লাগিয়ে রেখে এলাম।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই ছেলেরা দেখতে গেল ক'টা পাখি পড়েছে। যখন ফিরলো দেখলাম, শুধু পাখি নয়, অন্য জিনিসেও আটকেছে আঠা। হাত, মুখ, কাপড়–সব আঠায় মাখিয়ে ফিরেছে ছেলেরা।

ভীষণ ক্ষেপে গেল ওদের মা। ছেলেদের পরার মতো আর কোনো পরিষ্কার কাপড় নেই। আমি ওকে দুশ্চিন্তা করতে বারণ করলাম। বললাম, 'খানিকটা ছাই আর পানি হলে শিগগিরই ওগুলো পরিষ্কার করে ফেলা যাবে।' তারপর ছেলেদের দিকে চেয়ে বললাম, 'আমার ধারণা ছিলো আঠাতে শুধু ছোট ছোট পাখিই ধরা পড়বে, ছোট ছোট ছেলেও যে ধরা পড়বে, ভাবতে পারিনি।'

যাহোক, কয়েক দিনের ভেতর প্রচুর পাখি আটকালো আঠার ফাঁদে। তিন জোড়া চমৎকার পায়রাও ধরা পড়লো। পায়রাগুলো না খেয়ে পোষার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা।

ওদের জন্যে একটা বাসা তৈরি করলাম আমি আর ফ্রিৎস। রক ক্যাস্‌ল-এর কাছেই পাহাড়ের চূড়ায় কয়েকটা গর্ত করতে হলো সেজন্যে। তৈরি করার পর মনে হলো বেশ আরামদায়ক আর বড়সড়ই হয়েছে বাসাটা। অন্তত বিশ জোড়া পায়রা থাকতে পারবে ওতে। ভেতরে ওদের বসার জন্যে কয়েকটা দণ্ড লাগিয়ে দিয়েছি আড়াআড়ি ভাবে। ডিম পেড়ে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটানোর জন্যে খড়কুটোরও ব্যবস্থা করে দিলাম।

'আরো পায়রা দরকার আমাদের,' ফ্রিৎসকে বললাম। 'এত সুন্দর একটা ঘরের পক্ষে মাত্র ছ'টা খুব কম। আরো কিছু বুনো পায়রা ধরার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কি করে?'

কিছুক্ষণ ভেবে একটা বুদ্ধি এলো মাথায়। বললাম, 'পায়রা মৌরির খুব ভক্ত। আমাদের বাগানে প্রচুর মৌরি আছে। পুরো পায়রার বাসাটা মৌরি গাছ দিয়ে ডলে দেবো। আশা করি মৌরির গন্ধে অনেক পায়রা আসবে।'

পরিকল্পনা মতো কাজ করলাম। এবং পরদিনই ফল পাওয়া গেল। চারটে বুনো পায়রা এসে হাজির। কয়েক দিনের ভেতর আরো কয়েক জোড়া যোগ দিলো ওদের সাথে। আমাদের বানানো বাসায় নীড় বাঁধলো ওরা। কিছুদিন পর দেখা গেল, আমাদের যা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি পায়রা এসে গেছে। রীতিমতো হাট বসে গেছে যেন পায়রার। যাক, আর চিন্তা নেই, বর্ষার সময় তাজা মাংসও পাওয়া যাবে।

এর কয়েক দিন পরেই অল্পের জন্যে মারাত্মক এক বিপদ থেকে রক্ষা পেলো জ্যাক। কি কাজে যেন বাইরে বেরিয়েছিলো। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো কাদায় মাখামাখি হয়ে ফিরলো। এক বোঝা নল খাগড়া ওর কাঁধে। সেগুলোও কালো হয়ে আছে কাদায়। এক পাটি জুতো হারিয়ে এসেছে বেচারি। চেহারাটা করুণ। মনে হচ্ছে এই বুঝি কেঁদে ফেলবে।

ওর চেহারা দেখে হো-হো করে হেসে উঠলাম আমরা। কিন্তু এলিজাবেথ হাসলো না। বরং রেগে উঠলো।

'উল্লুক কোথাকার,' চিৎকার করলো সে, 'কোথায় গিয়েছিলি? কি করছিলি? বল! ইস, কাপড়গুলোর কি অবস্থা করেছে দেখ! ভেবেছিস আলমারি বোঝাই নতুন কাপড় নিয়ে বসে আছি তোর জন্যে, অ্যাঁ?'

'হা-হা-হা!' হাসলো ফ্রিৎস, 'কাদা মাখা হাঁসের মতো লাগছে ওকে।'

BanglaBook.org

'না না, কাদায় পড়া ইঁদুরের মতো!' হাসতে হাসতে বললো আর্নেস্ট।

জ্যাক মোটেই যোগ দিলো না আমাদের হাসিতে। শুকনো মুখে বলতে শুরু করলো ওর কাহিনী। শুনতে শুনতে আমাদের মুখ শুকিয়ে এলো। নিশ্চিত মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে ও। জলাভূমিতে নলখাগড়া কাটছিলো। কাটতে কাটতে বেশ ভেতরে চলে গিয়েছিলো জলার। হঠাৎ যখন টের পেলো পায়ের নিচে শক্ত মাটি নেই। তখন আর কিছু করার ছিলো না। আঠালো কাদা আটকে ধরে টেনে নিচ্ছিলো পাতালে। পনটো যদি না থাকতো কিছুতেই উঠে আসতে পারতো না জ্যাক।

বকাঝকা ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো এলিজাবেথ। ছল ছল করে উঠলো ওর চোখ। পারলে এক্ষুণি জড়িয়ে ধরে বুকে। কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকার পর ওকে টেনে নিয়ে গেল ধুইয়ে মুছিয়ে সাফ সুতরো করার জন্যে।

জ্যাকের মৃত্যু ঘটাতে যাচ্ছিলো বটে, তবে নলখাগড়াগুলো বেশ কাজের জিনিস বলে প্রমাণিত হলো। রোদে শুকানোর পর ওগুলো থেকে বেশ নমনীয় কাঠি পাওয়া গেল। সেই কাঠি দিয়ে ঝুড়ি তৈরি করলাম আমরা। অনেক সাধ্য সাধনার পর এলিজাবেথের জন্যে একটা চেয়ার-ও বানাতে পারলাম।

অবশেষে বর্ষার আগমন ধ্বনি শোনা যেতে লাগলো। পর পর বেশ কয়েকদিন মেঘলা রইলো আকাশ। তারপর হঠাৎ একদিন শুরু হলো বৃষ্টি। সেই সাথে ঝড়। একটানা পনেরো দিন চললো ঝড়ের তাণ্ডব। অবশেষে কমে এলো বাতাসের বেগ, কিন্তু বৃষ্টি চললো আরো বারো সপ্তাহ।

ভাগ্য ভালো রক ক্যাস্‌ল-এ করবার মতো অনেক কিছুই আছে আমাদের, ফলে দিনগুলো একঘেয়েমীর ভেতর দিয়ে গেল না। জন্তুগুলোকে প্রতিদিন খাবার দিতে হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হয়। সাফ সুতরো করতে হয় আস্তাবলটাও। দিনের বেশ অনেকটা সময় পেরিয়ে যায় এতে। বাকি সময় কাটে নানা রকম হাতের কাজ, গল্পগুজব, লেখা-পড়া করে। বাইরে কালো মেঘ থাকায় দিনের বেলায়ও খুব একটা আলো হয় না বসার ঘরটায়। সে জন্যে জাহাজের একটা বড় লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিয়েছি ছাদে। এমনভাবে বাতিটা লাগিয়েছি যাতে প্রয়োজনের সময় ওটা আমরা টেনে নামিয়ে আনতে পারি।

বিধ্বস্ত জাহাজ থেকে যে সব বই-পত্র এনেছিলাম সেগুলো রাখার জন্যে একটা বইয়ের তাক বানানো হলো এ সময়। বইগুলো বিষয় অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করে সাজিয়ে রাখা হলো তাতে। ইতিহাস, ভূ-গোল, উদ্ভিদ বিদ্যা, ভ্রমণ-কাহিনী, ভাষা-ও সাহিত্য–একেক তাকে একেক বিষয়ের বই।

ভাষা বিষয়ক প্রচুর বই আছে আমাদের কাছে। ব্যাকরণ আর অভিধানের মতো বই-ও রয়েছে। জার্মান আমাদের মাতৃভাষা। এবার আমরা খুব প্রয়োজনীয় একটা ভাষা–ইংরেজি শিখতে শুরু করলাম। এ ছাড়াও জ্যাক শিখতে লাগলো ইটালিয়ান আর স্প্যানিশ; আর্নেস্ট ল্যাটিন আর আমি মালয়ী। আমার কেন যেন ধারণা হয়েছে, আমাদের দ্বীপটা মালয়ের কাছাকাছি কোথাও। এবং একদিন না এক দিন ভাষাটা কাজে লাগবে। সবাই মিলে যখন একসাথে এই বিদেশী

BanglaBook.org

ভাষাগুলোর চর্চা করি তখন অদ্ভুত আওয়াজে ভরে যায় আমাদের বসার ঘর।

এবারও যখন বর্ষা থামলো তখন আমরা যে কি খুশি হলাম তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না! ছুটে বেরিয়ে এলাম গুহার বাইরে। বুক ভরে শ্বাস নিলাম মুক্ত বাতাসে। উপভোগ করলাম নীল আকাশের উজ্জ্বল সূর্যের আলো। চোখ ভরে দেখলাম গাছের, মাঠের তাজা সবুজ আর নানা রঙের অসংখ্য ফুলের সৌন্দর্য।

একদিন সকালে রক ক্যাস্‌ল-এর বাইরে কাজ করছি আমরা। হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো ফ্রিৎস:

'বাবা, ঐ দেখ! ঐ যে ওদিকে, ধুলো উড়ছে! নিশ্চয়ই বড় কোনো জন্তু আমাদের দিকে আসছে!'

'মনে হচ্ছে ভেড়া,' বললো এলিজাবেথ।

'না! না!' চিৎকার করলো ফ্রিৎস। 'গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। ঐ দেখ, উঠে দাঁড়াচ্ছে, মোটা খুঁটির মতো। পা নেই মনে হচ্ছে!'

তাড়াতাড়ি গুহায় ঢুকে দূরবীন নিয়ে এলাম। চোখে লাগিয়ে যেখানটায় ধুলো উড়ছে সেদিকে তাকালাম।

'এখন অনেক পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি,' বললো ফ্রিৎস। 'সবুজ রঙ ওটার। কি ওটা, বাবা? দূরবীনে দেখা যাচ্ছে না?'

'রক ক্যাস্‌ল-এ ঢুকে পড়ো! এক্ষুণি!'

'কেন? কি ওটা?'

'সাপ! বিরাট, ইয়া মোটা। এদিকেই আসছে। তাড়াতাড়ি! সবাই ভেতরে ঢুকে পড়ো!'

এক মুহূর্ত দেরি করলাম না আমরা। রক ক্যাস্‌ল-এ ঢুকে দরজা আটকে দিলাম। সবাই হাতে তুলে নিয়েছি বন্দুক। বারুদ, গুলি ভরে প্রস্তুত। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। বিরাট একটা সাপ, বোয়া-কন্সট্রিকটর, ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে, সোজা আমাদের দিকে। একটু পর পরই উঁচু হচ্ছে ওটা। মাটি থেকে কমপক্ষে বিশ ফুট হবে। ভীতিজনক একটা দৃশ্য।

সেতু পার হচ্ছে সাপটা। সেতু থেকে নামলো। এদিক ওদিক এক বার চেয়ে আবার এঁকেবেঁকে শরীর মুচড়ে এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদের গুহার দিকে।

রক ক্যাস্‌ল-এর ত্রিশ ফুটের ভেতর এসে গেছে সাপটা। এই সময় এক সঙ্গে গুলি ছুঁড়লো আর্নেস্ট, জ্যাক আর ফ্রান্সিস। কিন্তু লাগলো না সাপের গায়ে। একই ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে লাগলো ভয়ঙ্কর প্রাণীটা। এবার গুলি ছুঁড়লাম আমি আর ফ্রিৎস। লাগলো কিনা বুঝলাম না। তবে দেখলাম, মুখ ঘুরিয়ে আমাদের হাঁসগুলো যেখানে থাকে সেই জলার দিকে রওনা হলো সাপটা। একটু পরেই চলে গেল চোখের আড়ালে।

অদৃশ্য হয়েছে বোয়া-কন্সট্রিকটর কিন্তু আমরা স্বস্তি পাচ্ছি না। পরবর্তী তিন দিন আমরা কেউ গুহা ছেড়ে বেরোলাম না। আমার নিশ্চিত ধারণা এখনো জলায় রয়েছে দানবটা। হাঁসগুলোর ভীত চিৎকার শুনেই তা বুঝতে পারছি। দুর্ভাগ্য আমাদের, এই সময় এলিজাবেথ খাবার দিতে গেল জন্তুগুলোকে। অসাবধানে

BanglaBook.org

মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে আস্তাবলের দরজাটা খোলা রেখেছিলো। খেয়াল হতেই ছুটে দরজা বন্ধ করতে গেল। কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমাদের পুরনো গর্দভ গ্রিয়্‌ল দরজা খোলা পেয়ে বেরিয়ে পড়েছে। মনের আনন্দে দু'তিনটে লাফ দিলো সে রক ক্যাস্‌ল-এর সামনে, তারপর ছুটলো জলার দিকে।

আতঙ্কিত বোধ করতে লাগলাম আমরা। হাত পা গুটিয়ে আর বসে থাকতে পারলাম না। বেরিয়ে এলাম গুহা ছেড়ে। প্রত্যেকের হাতে বন্দুক, এমনকি এলিজাবেথের হাতেও। দুরু দুরু বুকে এগিয়ে গেলাম জলার দিকে।

মোড় ঘুরতেই চোখের সামনে ভেসে উঠলো ভয়ানক দৃশ্য। ভয়ে সারা শরীর হিম হয়ে আসতে চাইলো। নিজেদের অজান্তেই স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে গেলাম সবাই।

হতভাগ্য গ্রিয়্‌লকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে সাপটা। শরীর মুচড়ে চাপ দিয়ে চলেছে ক্রমশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রিয়্‌ল-এর হাড়গুলো চূর্ণ করে ফেললো ওটা। তারপর গিলতে শুরু করলো গাধাটাকে। একটু একটু করে গ্রিয়্‌ল-এর পুরো শরীরটা পেটের ভেতর ঢুকিয়ে ফেললো একসময়। ইতিমধ্যে কখন যে দীর্ঘ ছ'টা ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে আমরা টেরই পাইনি। সম্মোহিতের মতো দেখছিলাম সাপটার খাওয়া।

ভয়ানক আহার পর্ব শেষে আশ্চর্য এক ঘুম ঘুম ভাব দেখা গেল সাপটার ভেতর। নিস্পন্দের মতো যেখানে ছিলো সেখানেই পড়ে রইলো সে। এই আমাদের সুযোগ! বন্দুক হাতে ছুটলাম আমি। পেছনে পেছনে এলো ফ্রিৎস, জ্যাক, আর্নেস্ট। ফ্রান্সিস আর এলিজাবেথ দাঁড়িয়ে রইলো দূরে।

খাওয়ার পর অসহায় অবস্থা হয়েছে সাপটার। আমাদের দেখার জন্যে মাথা তুলবে সেটুকুও এখন ওর সাধ্যের বাইরে। কিন্তু তাতে আমাদের মন ভিজলো না। এক সঙ্গে গুলি করলাম আমি আর ফ্রিৎস। দুটো গুলিই লাগলো সাপের চোখে। সামান্য শরীর মোচড়ালো বোয়া-কন্সট্রিক্টর। তারপর স্থির হয়ে গেল।

'হুররে!' আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম আমরা।

আমার স্ত্রী আর ফ্রান্সিস এলো ছুটতে ছুটতে। জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো আমাদের। সন্দেহ নেই সাপটাকে মারতে পেরে আনন্দিত সবাই, তবে তার অনেক খানিই ম্লান হয়ে যাচ্ছে বেচারা গ্রিয়্‌ল-এর দুর্ভাগ্যের কথা মনে করে।

বাইশ

আর কোনো বোয়া-কন্সট্রিকটর আছে কিনা দেখার জন্যে বেশ কয়েকবার চক্কর দিলাম দ্বীপের বিভিন্ন অংশে। কিন্তু আর একটাও নজরে পড়লো না। তবে অন্যান্য কিছু অদ্ভুত প্রাণীর খোঁজ পাওয়া গেল। যেখানে মোষের পালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো সেই সমভূমির কাছাকাছি এক জায়গায় দেখা পেলাম সবচেয়ে অদ্ভুত জন্তুটার।

সেদিন ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে গেছি আমি। কুকুর দুটো ছাড়াও ফ্রিৎস-এর শিকারী ঈগলটা রয়েছে সাথে। সমভূমি পার হলাম—আজ আর মোষের পালের মুখোমুখি হতে হলো না। তারপর আর একটু এগোতেই এক মরুভূমিতে এসে পড়লাম আমরা। অসম্ভব গরম সেখানকার মাটি।

'নির্ঘাত আগ্নেয়গিরি এটা,' আর্নেস্ট বললো। 'মনে হচ্ছে আগুনের উপর দাঁড়িয়ে আছি!'

'ধৈর্য ধরো, বাপ,' বললাম আমি। 'সামনের ঐ পাহাড়টায় উঠবো আমরা। কে জানে ওপাশে কি আছে। হয়তো সবুজ চারণ-ভূমির দেখা পাবো।'

পাহাড়ে উঠলাম। কিন্তু সবুজ চারণ-ভূমি নয়, ওপাশে আরেকটা মরুভূমি। মন খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ ফ্রিৎস আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠলো, 'দেখ, বাবা, দেখ! দু'জন ঘোড়সওয়ার! এদিকে আসছে!'

বেশ মজা পেলাম আমি কথাটা শুনে।

'এই যে, ফ্রিৎস,' দূরবীনটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এটার ভেতর দিয়ে একবার দেখ তো, আমার চেয়ে বয়েস কম তোমার, চোখের শক্তি বেশি হওয়ার কথা। কি দেখছো এখন?'

'ঘোড়সওয়ার না! মনে হচ্ছে দুটো গরুগাড়ি, খড় বোঝাই দেয়া।'

'দেখি দেখি, আমি একটু দেখি,' ফ্রিৎস-এর হাত থেকে দূরবীনটা নিতে নিতে জ্যাক বললো। 'কে বললো গরুগাড়ি? ওরা ঘোড়সওয়ার-ই। বল্লম রয়েছে ওদের কাছে। একটা করে পতাকাও দেখছি!'

এবার আমার পালা। দূরবীনটা জ্যাকের কাছ থেকে নিয়ে তাকালাম সতর্ক চোখে। প্রথমে আমিও বুঝতে পারলাম না, ওদুটো আসলে কি। প্রায় মিনিট খানেক তাকিয়ে থাকার পর স্পষ্ট হলো।

'ঘোড়সওয়ারও না গরুগাড়িও না,' বললাম আমি। 'ওদুটো অস্ট্রিচ। চলো তো দেখি ধরা যায় কিনা। ঐ পাথরটার আড়ালে লুকোবো আমরা। সামনে দিয়ে যখন যাবে, ধরে ফেলবো খপ করে।'

দ্রুত অথচ প্রায় নিঃশব্দে চলে গেলাম পাথরটার পেছনে। একই গতিতে আপন মনে আসছে এখনো অস্ট্রিচ দুটো। কিন্তু ভাগ্য খারাপ আমাদের। যুতসই শিকার পাওয়া গেছে মনে করে তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটলো টার্ক আর পনটো। সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে শুরু করলো বিশাল পাখি দুটো। কুকুর দুটো পারলো না ওদের সাথে পাল্লা দিয়ে।

'জলদি ফ্রিৎস!' চিৎকার করলাম আমি। 'তোমার ঈগলটাকে পাঠাও ওদের পেছন পেছন!'

সঙ্গে সঙ্গে ঈগলের মাথা থেকে কাপড়ের আবরণ সরিয়ে পাখিটাকে ছেড়ে দিলো ফ্রিৎস। হাতের ইশারা আর মুখে কিছু শব্দ করে বুঝিয়ে দিলো কোন দিকে গিয়ে কি করতে হবে। মুহূর্তে ডানা মেললো ঈগল। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র লাগলো অস্ট্রিচ দুটোর কাছে পৌঁছুতে।

আকাশে বড় করে একটা চক্কর দিয়ে নেমে এসে ঈগলটা ঝাঁপিয়ে পড়লো একটা অস্ট্রিচের ওপর। একটু পরেই দেখা গেল মাটিতে হুটোপুটি করছে দুটো

BanglaBook.org

পাখি। অন্য অস্ট্রিচটা পালিয়ে গেল এই ফাঁকে। এবার সুযোগ পেলো টার্ক আর পনটো। ছুটে গিয়ে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিলো অস্ট্রিচটাকে। আমরা পৌঁছে দেখলাম মারা গেছে বেচারা।

দুঃখ পেলাম মনে। একটা তাজা অস্ট্রিচ ধরতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারা গেল না কুকুরগুলোর জন্যে। আপাতত মৃত পাখিটার রঙবেরঙের সুন্দর কিছু পালক নিয়েই সুন্তুষ্ট থাকতে হলো।

ইতিমধ্যে মরুভূমির রুক্ষ পরিবেশ আর গরমে অস্থির হয়ে পড়েছি আমরা। তাড়াতাড়ি বাড়ির পথ ধরলাম। কিছুদূর আসার পর আরো কয়েকটা অস্ট্রিচ দেখে ধরার ইচ্ছাটা আবার জেগে উঠলো। কুকুর দুটোকে বেঁধে ফেলা হলো সঙ্গে সঙ্গে। একটা আড়াল নিয়ে বসে পড়লাম আমরা। ঈগল পাখিটাকে যেকোনো মুহূর্তে উড়বার জন্যে তৈরি করে রাখলো ফ্রিৎস। সেই সাথে দড়ি দিয়ে একটা ফাঁসও বানিয়ে ফেললো।

লম্বা লম্বা পা ফেলে আমাদের কাছাকাছি চলে এলো অস্ট্রিচগুলো। বিশ গজও দূরে নেই আর। পনেরো গজ! দশ গজ! উঠে দাঁড়ালো ফ্রিৎস। ফাঁসটা মাথার ওপর তুলে বাতাসে দু'বার ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিলো অস্ট্রিজগুলোর দিকে। সাঁ করে উড়ে গেল ফাঁস। খপ করে পড়লো একটার মাথা গলে। ঘ্যাচ করে ফাঁসের দড়িতে টান দিলো ফ্রিৎস। আটকে গেল অস্ট্রিচের গলা। প্রাণ ভয়ে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ছুটে পালালো অন্যগুলো।

ফাঁস আলগা করার জন্যে প্রাণপণে যুঝছে পাখিটা। কিন্তু পারছে না। মনে মনে বললাম, 'হুঁ-হুঁ বাবা, এ হচ্ছে ফ্রিৎস-এর বানানো ফাঁস, এত সহজে ছুটবে না।'

কি করে পাখিটার লাফ ঝাঁপ থামানো যায় ভাবছি, এসময় আর্নেস্ট এগিয়ে গিয়ে একটা বস্তা পরিয়ে দিলো ওটার মাথায়। কিছুক্ষণের ভেতর শান্ত হয়ে গেল অস্ট্রিচটা। ফাঁস সামান্য ঢিলে করে দড়ি ধরে টানতেই ওটা চলতে লাগলো আমাদের পেছন পেছন।

মরুভূমি ছেড়ে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণের ভেতর একটা জঙ্গলে এসে পড়লাম। এই জঙ্গলে আগে কখনো আসিনি। চারদিক দেখতে দেখতে চলেছি। বাড়ি যাওয়ার জন্যে অস্থির সবাই, তাই দ্রুত হাঁটছি। আর্নেস্টের তাড়া যেন একটু বেশি। আমাদের সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে ও। সামনে একটা ঝোপের কাছে শেষবারের মতো দেখেছি, তারপরেই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। হঠাৎ দেখলাম, ছুটতে ছুটতে আসছে আর্নেস্ট। মুখ রক্তশূন্য, কাঁপছে।

'ভালুক! ভালুক! আমাকে তাড়া করে আসছে!' চিৎকার করতে করতে আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সে।

ভালুক–শব্দটা শুনেই চমকে উঠেছি। তবু আর্নেস্টকে সাহস দেয়ার জন্যে মুখ খুলতে গেলাম। কিন্তু একটা শব্দ-ও উচ্চারণ করতে পারলাম না। তার আগেই দেখলাম, সেই ঝোপটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে দুটো বিশাল আকারের ভালুক। সোজা ছুটে আসছে আমাদের দিকে। এক ঝটকায় আর্নেস্টকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে কাঁধ থেকে খুলে নিলাম বন্দুক। জ্যাক আর ফ্রিৎস-ও

BanglaBook.org

বন্দুক নিয়ে তৈরি। আতঙ্কিত আর্নেস্ট মোটা একটা গাছের গুঁড়ির পেছনে গিয়ে লুকালো।

ভালুক দুটো কাছে এসে গেছে। জ্যাক, আমি আর ফ্রিৎস বন্দুকের বাঁট কাঁধে লাগিয়ে তাক করলাম। আরো কয়েক পা এগোলো ভালুকগুলো। একসঙ্গে ঘোড়া টানলাম তিনজন। দুটো ভালুকেরই মাথায় লাগলো গুলি।

'হুররে!' চিৎকার করে উঠে আর্নেস্টের খোঁজে গেল ছেলেরা।

আর্নেস্ট জানালো, জ্যাককে ভয় দেখানোর জন্যে এগিয়ে গিয়েছিলো ও। ভেবেছিলো আচমকা ঝোপের আড়াল থেকে *হালুম* করে লাফিয়ে পড়বে জ্যাকের ওপর। কিন্তু দুর্ভাগ্য, দুটো আসল ভালুক আগে থাকতেই ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলো ওখানে।

নিরাপদে বাড়ি ফিরলাম আমরা। সঙ্গে একটা জ্যান্ত অস্ট্রিচ আর চমৎকার দুটো ভালুকের চামড়া। ফ্রান্সিস আর এলিজাবেথ ছুটে এলো। এমন একটা পাখি আমরা ধরে আনতে পেরেছি দেখে বিস্মিত ওরা।

কিছুদিনের ভেতর পোষ মেনে গেল অস্ট্রিচটা। আমরা ওকে সওয়ার পিঠে নিয়ে হাঁটতে শেখালাম। আমাদের সেরা সওয়ারী জ্যাক দুর্দান্ত গতিতে ওটাকে ছোটানোর কৌশল রপ্ত করলো। এই গতি দেখে অস্ট্রিচটার নাম দিলাম আমরা *হারিকেন*।

BanglaBook.org

তেইশ

নিজেদের চেষ্টায় একটা ক্যানো তৈরি করেছে ছেলেরা। কিছু বুদ্ধি পরামর্শ দেয়া ছাড়া ওটা বানানোর সময় কোনো রকম সাহায্য আমি করিনি। সেজন্যে ক্যানোটা নিয়ে খুব গর্বিত ওরা। এই ক্যানোয় চড়ে প্রায়ই ওরা বেরিয়ে পড়ে অভিযানে। প্রথম প্রথম আমি আর এলিজাবেথ এ নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করতাম। সমাধান দিলো আর্নেস্ট।

'এরপর থেকে যখন যাবো,' বললো ও, 'সঙ্গে করে দুটো তিনটে পায়রা নিয়ে যাবো। কিছুক্ষণ পরপরই আমরা চিঠি পাঠাবো ওদের পায়ে বেঁধে। যখন বাইরে থাকবো তখন আমাদের খবরাখবর পেতে কোনো অসুবিধা হবে না তোমাদের।'

সত্যিই তাই। পায়রাগুলো আমাদের ডাক হরকরা হয়ে উঠলো। এখন ছেলেরা একা একা বাইরে বেরোলেও আমরা তেমন দুশ্চিন্তা করি না, কারণ এক বা দু'ঘণ্টা পরপরই পায়রার মাধ্যমে খবর পাই, কেমন আছে ওরা।

যখন ফিরে আসে, প্রতিবারই ছেলেরা নতুন কিছু একটা সঙ্গে নিয়ে আসে, নিদেন পক্ষে খোঁজ আনে কোনো নতুন জিনিসের।

একদিন ওরা কয়েকটা জ্যান্ত খরগোশ নিয়ে এলো। সেফটি বে-র ছোট্ট একটা দ্বীপে সেগুলোকে ছেড়ে দিয়ে এলাম আমরা। দ্বীপটায় পাখি ছাড়া আর কোনো প্রাণীর বসতি নেই। এখন যদি খরগোশের একটা উপনিবেশ গড়ে ওঠে

তো মন্দ কী? রক ক্যাস্‌ল বা ফ্যালকন্‌স নেস্টের আশেপাশে ওগুলোকে রাখা নিরাপদ মনে করলাম না। কারণ, কোনো ভাবে যদি ছাড়া পায় তাহলে আমাদের সবজি বাগানের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।

একদিন কয়েকটা হরিণের বাচ্চা নিয়ে এলো ওরা। কিছুদিন নিজেদের কাছে রেখে একটু বড় করে অন্য একটা ছোট দ্বীপে ছেড়ে এলাম ওদের। এক সময় বড় একটা হরিণের পাল হবে ঐ দ্বীপে। তখন মাংসের অভাব হলেই দু-একটা মেরে নিয়ে আসতে পারবো ওখান থেকে।

ছেলেরা যে কেবল শিকার করে বা নতুন নতুন প্রাণী ধরে; গাছ, ফল যোগাড় করে দিন কাটাচ্ছে তা কিন্তু নয়। আরো অনেক কিছু করতে হয় ওদের। আমাদের পোষা জন্তুগুলোর দেখা শোনা করে ওরা। খামারের তদারকিও করতে হয়। মৌমাছি আর পায়রার সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে নতুন বাসা তৈরি করে দিতে হয়েছে ওদের। মাঝে মাঝেই সেফটি বে-র দ্বীপগুলোতে গিয়ে খরগোশ আর হরিণগুলোর তদারক করে আসতে হয়।

এছাড়াও ফসলের মাঠ এবং বাগানে কাজ করতে হয় ওদের। জমি চষা, বীজ বোনা, আগাছা পরিষ্কার করা, সবশেষে ফসল কাটা। এর প্রতিটি কাজেই আমাকে সাহায্য করে ওরা। আমাদের সবগুলো বাড়ির চারপাশে এখন শস্য খেত, তরকারী বাগান, ফল বাগান। এমনকি ধানখেত আর চা বাগানও করেছি আমরা। রক ক্যাস্‌ল-এর কাছে জলাভূমিটায় বাসা বেঁধেছে অসংখ্য পাখি। তার ভেতর আছে অপূর্ব সুন্দর কালো রাজহাঁস, সাদা হাঁস আর লাল ফ্ল্যামিঙ্গো।

নির্দ্বিধায় আমি স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করতে পারি আমাদের দ্বীপটাকে। নিজেদের সুখী, পরিতৃপ্ত করার মতো সব জিনিসই আছে আমাদের—কেবল একটা জিনিস ছাড়া। মানুষ! আমাদের মতোই আরো মানুষের সাহচর্য পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছি আমরা। আবার কি কখনো দেখা হবে সভ্য জগতের সভ্য মানুষের সঙ্গে? আশাই কেবল করতে পারি আমরা।

দ্বীপে ওঠার পর দশ বছর কেটে গেছে। দশটা অত্যন্ত ব্যস্ত, সুখী, পরিতৃপ্ত বছর! কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং সেই মতো অর্জন-ও করেছি। আমি আমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে গর্বিত। ওরা ছিলো বলেই তো এত কিছু করতে পেরেছি আমি। আসলে আমরা সবাই সবার জন্যে করেছি, একান্ত নিজের জন্যে কিছুই করিনি কেউ। আমাদের ভেতর কোনো ফাঁকি বা মিথ্যা ছিলো না। কেউ কারো সঙ্গে কখনো প্রতারণা করিনি। এমনকি নিজের সঙ্গেও না। ঈশ্বর এর পুরস্কার দিয়েছেন। পরিপূর্ণ ভাবে দিয়েছেন। তাই তো আমরা স্বর্গের সঙ্গে এই দ্বীপের কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই না।

ফ্রিৎস-এর বয়েস এখন পঁচিশ। চমৎকার সুদর্শন, সাহসী এক যুবক এখন ও। আর্নেস্ট তেইশ। অন্য ভাইদের মতো অত শক্তিশালী নয়, তবে সবচেয়ে বুদ্ধিমান যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জ্যাক এখন বাইশ বছরের। আমার ছেলেদের ভেতর সবচেয়ে সাহসী। ফ্রান্সিসের বয়েস আঠারো। লম্বা, বলিষ্ঠ দেহ, আহ্লাদী স্বভাবটা এখনো আগের মতোই আছে। আমার স্ত্রী এলিজাবেথের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ওকে দেখে কেউ বলবে না ইতিমধ্যে দশ বছর বেড়ে

BanglaBook.org

গেছে ওর বয়স। তবে আমার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। চোখেও আর তত ভালো দেখি না আজকাল। তবু আগের মতোই কর্মঠ আর মনের দিক থেকে যুবক রয়েছি আমি।

দ্বীপে ওঠার দশম বার্ষিকী উদযাপন করলাম যেদিন তার কিছুদিন পরে একদিন ভোর বেলা। আমরা সবাই তখনো ঘুমিয়ে। ফ্রিৎস উঠে একা একা বেরিয়ে গেল গুহার বাইরে। আমরা কেউ কিছু টের পাইনি। ঘুম থেকে ওঠার পর সবাই যখন প্রার্থনায় বসেছি তখন খেয়াল হলো, ফ্রিৎস নেই। তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে খুঁজলাম। নেই। চিৎকার করে ডাকলাম। কোনো সাড়া শব্দ পেলাম না। দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল মন। কিছুক্ষণ পর মনে হলো, সাগর তীরে গিয়ে দেখলে হতো একবার।

গেলাম সাগর তীরে। এতক্ষণ যা সন্দেহ করছিলাম ঠিক তাই। ক্যানোটা নেই। তারমানে আমাদের কিছু না বলে কোথাও গেছে ফ্রিৎস। গুহায় ফিরে এলিজাবেথকে আশ্বস্ত করলাম, 'চিন্তা কোরো না, ক্যানো নিয়ে কোথাও গেছে। এসে পড়বে।'

দুপুর গেল, সন্ধ্যা হলো। রাত নেমে এলো চরাচরে। এলো না ফ্রিৎস। পরদিন-ও না, তার পরের দিন-ও না। আবার উতলা হয়ে উঠলো ওর মা-র মন। কামান দেগে বিপদ সংকেত দেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো আমাকে। অবশেষে জ্যাককে বললাম, ছোট কামানটায় বারুদ ভরে ফাঁকা আওয়াজ করতে। কামান দাগার কিছুক্ষণের ভেতর ফিরে এলো ফ্রিৎস।

মহামূল্যবান কিছু জিনিস নিয়ে এসেছে ও। সামুদ্রিক ঝিনুক আর মুক্তায় ভর্তি ওর ক্যানো। ইউরোপের বাজারে মুক্তাগুলো বিক্রি করতে পারলে বেশ মোটা একটা অঙ্ক নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু কোথায় ইউরোপ আর কোথায় আমরা! কিন্তু তা নিয়ে খুব একটা আক্ষেপ করতে দেখলাম না ফ্রিৎসকে। অন্য কি একটা নিয়ে যেন বেশ উত্তেজিত ও। আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বললো, 'দারুণ একটা খবর আছে, বাবা, তোমার জন্যে। সবাই অন্য দিকে গেলে বলবো।'

একটু পরেই যার যার কাজে চলে গেল সবাই। আমরা একা হলাম।

'বলো এবার,' বললাম আমি।

'অন্যদের এই মুহূর্তে জানাতে চাই না খবরটা,' ব্যাখ্যা করলো ফ্রিৎস। 'কারণ শেষ পর্যন্ত হয়তো কিছুই ঘটবে না। আশা দিয়ে নিরাশ করতে চাই না ওদের।

'বুঝলাম। কিন্তু খবরটা কি, তা বলবে তো।'

'এমন একটা জিনিসের খোঁজ আমি পেয়েছি, টাকার অঙ্কে হিসেব করতে গেলে দুনিয়ার সব মুক্তার চেয়ে তার দাম বেশি।'

'ভূমিকা রেখে বলো তো কি!' আমার ভেতরেও সংক্রমিত হয়েছে উত্তেজনা।

'অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটেছে, বাবা,' বলে চললো ফ্রিৎস। 'বললে বিশ্বাস করবে না, ঐদিকে তীরে বসে বসে ঝিনুক থেকে মুক্তা বের করছিলাম। হঠাৎ এক

BanglaBook.org

গাদা সামুদ্রিক পাখি হাজির হলো সেখানে। দল বেঁধে উড়তে লাগলো আমার চারপাশে। লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে একটা পাখিকে আহত করলাম। বালির উপর পড়ে যখন ডানা ঝাপটাচ্ছে তখন গিয়ে ওটাকে তুলে নিলাম। ভালো করে তাকাতেই দেখলাম–বললে বিশ্বাস করবে?–দেখলাম ওটার পায়ে এক টুকরো কাপড় জড়ানো। কি যেন লেখা তার ওপর। লেখাটা পড়লাম–একটা খবর!'

'খবর!' বিস্ময় চাপতে পারলাম না আমি। 'কি খবর?'

'কাপড়টায় লেখা, *জাহাজডুবি হওয়া নাবিককে বাঁচাও। আমি স্মোকিং আইল্যাণ্ডে আছি।* বুঝতেই পারছো, নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি। মনে হচ্ছিলো; স্বপ্ন দেখছি, নয়তো পাগল হয়ে গেছি। যখন নিশ্চিত হলাম, স্বপ্ন নয়, পাগলও হয়ে যাইনি তখন ঠিক করলাম খুঁজে বের করবো স্মোকিং আইল্যাণ্ড এবং বাঁচাবো ঐ হতভাগ্য নাবিককে। উহ্, সত্যি যদি বাঁচাতে পারতাম! যাহোক আরেক টুকরো কাপড়ে লিখলাম, *ঈশ্বরের ওপর আস্থা রাখো। সাহায্য কাছেই।*

'ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে আহত পাখিটা। ওর পায়েই বেঁধে দিলাম কাপড়ের টুকরোটা। ছেড়ে দিতে উড়ে চলে গেল সে–আশা করি জাহাজডুবি হওয়া নাবিককে খুঁজে পাবে। তারপর আর দেরি করিনি, সোজা চলে এসেছি তোমাকে বলতে। কাল আবার যাবো আমি। খুঁজে বের করবো স্মোকিং আইল্যাণ্ড।'

'নিশ্চয়ই যাবে,' বললাম আমি। 'আমরা সবাই যাবো তোমার সাথে। স্মোকিং আইল্যাণ্ড বা তোমার সেই নাবিক সম্পর্কে এখন কিছু জানাবো না ওদের। আমরা ভাব দেখাবো, মুক্তা সংগ্রহের জন্যে যাচ্ছি। যখন আর সবাই মুক্তা খুঁজবে তখন তুমি চলে যেও স্মোকিং আইল্যাণ্ডের খোঁজে।'

পরদিন অবশ্য রওনা হতে পারলাম না। যাত্রার প্রস্তুতি নিতেই চলে গেল দুটো দিন। আমরা যখন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করছি দ্বীপের বিভিন্ন এলাকা থেকে তখন লুকিয়ে লুকিয়ে দ্বিতীয় একটা বসবার জায়গা করলো ফ্রিৎস ওর ক্যানোয়।

তৃতীয় দিন সকালে রওনা হলাম আমরা। ফ্রিৎস ওর ছোট ক্যানোয়, আর বাকি সবাই বড় একটায়। দ্বীপের যে পাশে মুক্তা পাওয়া যায় সেখানকার সাগরে বেশ কয়েকদিন ভেসে বেড়ালাম আমরা। প্রচুর মুক্তা সংগ্রহ করতে পারলাম। এর ভেতর দু'তিনবার কিছু সময়ের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ফ্রিৎস। সবাই ভাবলো মুক্তা খুঁজতে অন্য কোনো দিকে গেছে। ওদের ভুল ধারণা আমি ভেঙে দিলাম না। প্রতিদিনই একা একা ফিরলো ফ্রিৎস। অবশেষে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। ফ্রিৎস-ও রওনা হলো ওর ক্যানো নিয়ে। ভাবলাম, স্মোকিং আইল্যাণ্ড খোঁজার বুদ্ধিটা বোধহয় বাদ দিয়েছে। কিন্তু না! একটু পরেই ভুল ভাঙলো আমার। রওনা হয়েছে ফ্রিৎস, তবে বাড়ির দিকে নয়, উল্টো দিকে।

'আমি শিকারে চললাম, বাবা,' চিৎকার করে বললো ও। 'কোথায় তা তুমি জানো।' দ্রুত বৈঠা বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ফ্রিৎস।

'সাবধানে থেকো,' পেছন থেকে চেঁচালাম আমি। 'বেশি দেরি কোরো না।'

BanglaBook.org

নিরাপদে বাড়ি পৌঁছুলাম আমরা। কিন্তু এলিজাবেথ খুব চিন্তিত।

'খোকা কোথায় গেল ফ্রিৎস?' বললো ও। 'মুক্তা খুঁজতে? এত মুক্তা দিয়ে কি করবো আমরা?'

আসলে ফ্রিৎস কোথায় গেছে এবার আমি খুলে বললাম। শুনে শান্ত হলো বললো, 'তা হলে এসো, আমরা প্রার্থনা করি, যেন ঠিকমত লোকটাকে উদ্ধার করে আনতে পারে আমাদের ছেলে।'

পাঁচ দিন পেরিয়ে গেছে। কোনো খবর নেই ফ্রিৎস-এর। দুশ্চিন্তায় পাগল হওয়ার দশা ওর মায়ের। আমারও। এরপর আর বসে থাকা যায় না। ঠিক করলাম পানসিতে চড়ে ফ্রিৎস-এর খোঁজে বেরোবো। প্রথমে যাবো মুক্ত পাওয়া যায় যে উপসাগরে সেখানে। আর্নেস্ট, জ্যাক আর ফ্রান্সিস-ও যেতে চাইলো। আপত্তি করার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না আমি। যদিও সাগরকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে তবু এলিজাবেথও আমাদের সঙ্গী হলো।

রওনা হলাম আমরা। চমৎকার আবহাওয়া। ছেলেরা বেশ উপভোগ করছে বেড়ানোটা। আমিও করতাম, যদি না দুশ্চিন্তায় অস্থির থাকতাম। মুক্তা উপসাগরে প্রায় পৌঁছে গেছি, এমন সময় হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো ফ্রান্সিস:

'দেখ দেখ! মানুষখেকো জংলী!'

এক সঙ্গে সব ক'জন আমরা ছুটে গেলাম পানসির কিনারে। উদ্বিগ্ন চোখে তাকালাম ফ্রান্সিসের দৃষ্টি অনুসরণ করে। ছোট্ট একটা ক্যানো এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। এবং সত্যিই একজন জংলী বসে আছে তাতে। তার সারা শরীর বিচিত্র রঙে রাঙানো। চুলে গোঁজা পাখির পালক।

'নিশ্চয়ই আরো আছে,' চেঁচালো জ্যাক। 'ও, বাবা, ওরা খেয়ে ফেলবে আমাদের!'

দ্রুত দাঁড় বেয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো জংলীটা। আরেকটু কাছে আসতেই বুঝলাম আসলে ওটা কে!

'আরে, ফ্রিৎস দেখছি!' এবারও জ্যাকই চিৎকার করলো। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক্যানোটাও তো ওরই। জংলীর মতো সেজেছে ফ্রিৎস!'

একটু পরেই পানসির গায়ে এসে লাগলো ক্যানো। ফ্রিৎস উঠে এলো পানসিতে। এলিজাবেথ ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো ছেলেকে। কান্না চেপে রাখতে পারলো না। ভাইরা ঘিরে ধরলো ফ্রিৎসকে। এক সাথে সবাই প্রশ্ন করছে। ফ্রিৎস বেচারা বুঝতে পারছে না কারটা রেখে কারটার জবাব দেবে।

'ভেবেছিলাম জংলীদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে,' অবশেষে বললো ও। 'তাই আগেভাগেই সাবধান হয়েছিলাম। জংলীরা যেন আমাকেও জংলী মনে করে তাই ওদের মতো সাজ নিয়েছিলাম।'

আমি একটাই মাত্র প্রশ্ন করলাম ওকে। 'লোকটাকে পেয়েছো খুঁজে?'

উৎফুল্ল ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো ফ্রিৎস। 'আমার সাথে এসো, দেখাবো তোমাদের।'

আবার ক্যানোয় নামলো ফ্রিৎস। আমাদের বললো পানসি নিয়ে ওর পেছন পেছন যেতে।

BanglaBook.org

পাল তুলে দিলাম আমরা। ফ্রিৎসকে অনুসরণ করে পেরিয়ে গেলাম মুক্তা উপসাগর। আরও কিছুদূর এগোনোর পর ছোট্ট একটা দ্বীপে পৌঁছুলাম। পাহাড়ী হলেও প্রচুর গাছ আর ঘাসের সমারোহ সেখানে। ক্যানো তীরে ভিড়িয়ে নেমে দাঁড়ালো ফ্রিৎস। আমরাও নোঙর ফেলে নেমে এলাম পানসি থেকে। ফ্রিৎস-এর পেছন পেছন এগোলাম সবাই। ছেলেরা একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছে, 'কোথায় যাচ্ছি? কেন যাচ্ছি? কি খুঁজছি?'

'ধৈর্য ধরো,' রহস্যময় এক টুকরো হাসি হেসে বললাম আমি। 'নিজের চোখেই দেখবে।'

ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে নিয়ে চললো ফ্রিৎস। অবশেষে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছুলাম। সেখানে, আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর। এক পাশে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা। নিশ্চয়ই কেউ থাকে এখানে!

নিচু স্বরে একটা শিস বাজালো ফ্রিৎস। একটু পরেই একটা গাছ থেকে নেমে এলো তরুণ এক নাবিক। আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। নিঃশব্দে আমরা তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। আমাদের কথা বলার শক্তিটুকুও লুপ্ত হয়ে গেছে যেন। দশ বছরের ভেতর এই প্রথম একটা নতুন মুখ, একটা জীবিত মানুষের মুখ দেখলাম।

হাত ধরে তরুণকে আমাদের আরো কাছে নিয়ে এলো ফ্রিৎস।

'এই হচ্ছে আমার বাবা,' পরিচয় করিয়ে দিলো ও। 'ইনি মা, আর এরা আমার ভাই।' এরপর আমাদের দিকে ফিরলো ফ্রিৎস। 'নতুন একটা ভাই পেয়েছি আমরা। এর নাম এডওয়ার্ড মন্টরোজ, ইংরেজ। জাহাজডুবির পর আশ্রয় নিয়েছে এদ্বীপে।'

সোল্লাসে চিৎকার করে তরুণ নাবিককে স্বাগতম জানালাম আমরা। এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরলাম আমি। আরে এ তো নাবিকের কড়া পড়া হাত নয়! কেমন তুলতুলে নরম! মেয়ে নাকি? এবার আরো ভালো করে তাকালাম ওর মুখের দিকে, শরীরের দিকে। হ্যাঁ ঠিক, এ ছেলে হতেই পারে না। যা হোক, এ সম্পর্কে আপাতত কোনো উচ্চবাচ্য করলাম না আমি। শুধু বললাম, 'আর কোনো চিন্তা নেই, আমাদের সাথে নিরাপদে এবং ভালো ভাবেই থাকতে পারবে তুমি।'

শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লো নাবিকটা। দু'হাত বাড়িয়ে এলিজাবেথকে জড়িয়ে ধরলো সে।

ফ্রিৎস এক পাশে টেনে নিয়ে গেল আমাকে। বললো, 'নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, ও আসলে ছেলে নয়। বেচারি! জানো তিন বছর ধরে একা একা আছে এ দ্বীপে। ওর অনুরোধেই তোমাদের কাছে ওকে ছেলে বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। ওর ভয়, আমার ভাইরা হয়তো মেয়ে শুনলে ওকে আশ্রয় দিতে আপত্তি করবে।'

'পাগল!' একটু হেসে আমি বললাম।

ছেলেরা এখন শতকণ্ঠে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে নাবিককে। ওদের প্রশ্নের জবাব দিতে রীতিমতো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে বেচারা। এলিজাবেথ তাড়াতাড়ি এসে উদ্ধার করলো ওকে। খাবার তৈরিই ছিলো। খেয়ে নিলাম আমরা। তারপর

BanglaBook.org

মেয়েটাকে পানসিতে নিয়ে গেল আমার স্ত্রী। রাতে ওরা ওখানেই থাকবে, আমরা পুরুষরা থাকবো মেয়েটার কুটিরে।

রাতে আগুনের পাশে বসে ফ্রিৎস তার কাহিনী শোনালো আমাদের।

'তোমাদের ছেড়ে আসার পর,' শুরু করলো ফ্রিৎস, 'পুরো দুই দিন ক্যানোয় করে এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু স্মোকিং আইল্যাণ্ডের কোনো খোঁজ পেলাম না। আশা হারিয়ে ফেলতে লাগলাম। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার একটু আগে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামলাম একটা দ্বীপে। খুব খিদে লেগেছিলো, তাই ঈগলটাকে উড়িয়ে দিলাম একটা পাখি ধরে আনার জন্যে। ঠিক সেই সময় পেছনের ঝোপে কিছু একটা নড়াচড়ার আওয়াজ পেলাম। চমকে ঘুরে তাকাতেই দেখি, আর কিছু না, বাঘ! লাফিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি। তখন আত্মরক্ষা করার মতো কোনো অস্ত্র নেই আমার কাছে। বন্দুক মাটিতে নামিয়ে রেখেছিলাম ঈগলটাকে ছাড়ার সময়। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো আমার। সম্ভবত বাঘের পেটেই যেতে হতো আমাকে, বাঁচিয়ে দিলো ঈগলটা। সাঁ করে নেমে এসে সোজা ঠোকর লাগালো বাঘটার চোখে। লাফ দেয়া আর হলো না তার, ঈগলটাকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এই ফাঁকে বন্দুক তুলে নিয়ে গুলি করলাম আমি। মারা গেল বাঘটা। কিন্তু...,' এখানে কান্নায় বুজে এলো ফ্রিৎস-এর গলা। 'বাঘটা মরলো, কিন্তু ঈগলটাকে ততক্ষণে মেরে ফেলেছে সে।'

এক মুহূর্ত থামলো ফ্রিৎস। তারপর বলে চললো, 'সঙ্গে সঙ্গে ও জায়গা থেকে সরে পড়লাম আমি। আবার ক্যানোয় করে সাগরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে চারদিক। কি করা যায় ভাবছি, এমন সময় চোখ গেল আরেকটা দ্বীপের দিকে। খুব বেশি দূরে নয়। কালো ধোঁয়া উড়ছে দ্বীপটার মাঝামাঝি জায়গা থেকে। লাফিয়ে উঠলো আমার হৃৎপিণ্ড। *স্মোকিং আইল্যাণ্ড?* গিয়েই দেখা যাক।

'দ্বীপটায় পৌঁছে গাছপালার ভেতর দিয়ে পথ করে কিছুদূর এগোনোর পর একটা ফাঁকা জায়গায় উপস্থিত হলাম। সে জায়গার এক ধারে একটা ছোট্ট কুটির। কুটিরের সামনে বসে আছে একটা মানুষ—একটা জ্যান্ত মানুষ! উহ, বাবা, কি খুশি যে লাগছিলো লোকটাকে দেখে কি করে বোঝাবো! স্রেফ দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোলো না। লোকটাও তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। সে-ও স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

"তোমার বার্তা আমি পেয়েছি," অবশেষে বলতে পারলাম আমি, "তোমাকে উদ্ধার করার জন্যে এসেছি।"

'তারপর জেনি...'

'জেনি! জেনি!' হৈ-হৈ করে উঠলো আর্নেস্ট, জ্যাক, ফ্রান্সিস। 'জেনি কে? ঐ নাবিকটা? ও মেয়ে? আমাদের নতুন ভাই আসলে বোন?'

অস্বীকার করতে পারলো না ফ্রিৎস। বললো, 'বোন হোক আর ভাই হোক, ওর সাথে সব সময় খুব ভালো ব্যবহার করবে তোমরা। তিন বছর একা একা এই দ্বীপে কাটিয়েছে বেচারি। মানুষের সাথে ব্যবহার হয়তো ভুলেই গেছে।'

পরদিন সকালে দেখা গেল ছোট তিন ছেলে খুবই লজ্জা পাচ্ছে মেয়েটার

BanglaBook.org

সামনে। মুখ খোলারই সাহস পাচ্ছে না যেন।

'আশা করি মেয়ে বলে আমার ওপর রাগ করোনি তোমরা,' নরম করে বললো জেনি। 'নতুন ভাইকে যেমন খুশির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলে দয়া করে নতুন বোনকেও তেমনি করে গ্রহণ করবে।'

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!' এক সঙ্গে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলো তিন ভাই।

এর পর জেনি তার কাহিনী শোনালো আমাদের। থেমে থেমে, অনেক দ্বিধার সঙ্গে কাহিনীটা শেষ করলো ও। সম্ভবত দীর্ঘদিন মানুষের সঙ্গে কথা বলেনি বলেই অতবার থামতে হলো ওকে।

'আমার বাবা মা ইংরেজ,' শুরু করলো সে; 'কিন্তু আমি বড় হয়েছি ভারতে। আমার বাবা, স্যার এডওয়ার্ড মন্টরোজ চাকরি করতেন ওখানে। আমার বয়স যখন তিন বছর তখন মা মারা যায়। বাবার কাছে বড় হয়েছি আমি। ছেলে হলে যে ভাবে করতেন ঠিক তেমন করে আমাকে মানুষ করেছেন তিনি। সাঁতার কাটা, বন্দুক ছোঁড়া, ঘোড়ায় চড়া সব ব্যাপারেই আমি পটু হয়ে উঠেছিলাম অল্প বয়সেই। ভাগ্য ভালো আমাকে বাবা শিখিয়েছিলেন ওসব, না হলে ঐ জাহাজডুবির পর কিছুতেই বাঁচতে পারতাম না।'

থামলো জেনি। তারপর আবার বলতে লাগলো, 'তিন বছর আগে ভারতে কাজের মেয়াদ শেষ হয় বাবার। ইংল্যাণ্ডের পথে রওনা হলেন তিনি। আমিও যাচ্ছিলাম বাবার সাথে। তবে এক জাহাজে নয়। দু'জন ছিলাম দুই জাহাজে। আমার জাহাজ ডুবে গেল ঝড়ের মুখে...'

'ইস, বেচারা!' অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলো এলিজাবেথ।

'প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো,' বলে চললো জেনি। 'শুধু কাঁচা ডিম খেয়ে কাটিয়েছি অনেক দিন। এক পাহাড়ের কোটরে পেয়েছিলাম ডিমগুলো। কিসের জানি না। তারপর আস্তে আস্তে কুটিরটা বানালাম, আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করলাম। ভয়ানক কষ্ট হয়েছিলো আগুন জ্বালতে। তাই যাতে নিভে না যায় সেজন্যে সব সময় সতর্ক থাকতে হতো। ধীরে ধীরে মাছ ধরা শিখলাম, শিকার করতে শিখলাম। কোনো রকমে প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রেখেছি এসব করে।'

সেই সকালেই স্মোকিং আইল্যাণ্ড ছেড়ে এলাম আমরা। জেনিকে আর তার সামান্য সম্পত্তি যা ছিলো সব নিয়ে নিলাম সঙ্গে।

চব্বিশ

বাড়ি ফেরার পথে কেপ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টে সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে একবার নোঙ্গর ফেললাম আমরা। ফ্রিৎস আর ফ্রান্সিস নেমে গেল পানসি থেকে। ডাঙা পথে আমাদের আগে রক ক্যাস্‌ল-এ পৌঁছুবে ওরা। জেনির আগমন উপলক্ষে সাজিয়ে গুছিয়ে ফেলবে গুহাবাড়িটাকে।

কেপ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টে আমাদের খামার বাড়িতে আরাম আয়েশের

বন্দোবস্ত দেখে অবাক হয়ে গেল জেনি। আমাদের পোষা জন্তু, শস্যখেত, সবজি বাগান, ফল বাগান দেখে বিস্ময়ে ছোটো বাচ্চার মতো চেঁচিয়ে উঠলো সে।

কেপ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টে কিছু সময় কাটিয়ে আবার পানসিতে চড়লাম আমরা। পাল তুলে সেফটি বে-র দিকে হাল ধরলাম। আমরা যখন তীরের কাছাকাছি পৌঁছেছি, দশবার তোপধ্বনি করে স্বাগতম জানানো হলো আমাদের। আমরাও দশবার কামান দেগে জবাব দিলাম। বড় ক্যানোয় চড়ে আমাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে রওনা হলো ফ্রিৎস আর ফ্রান্সিস। পানসিটার চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে আগে আগে চললো ওরা। জেনি যখন আমাদের দ্বীপে পা রাখলো চার ছেলেই এক সঙ্গে উৎফুল্ল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, 'হুররে!'

ফ্রিৎস ধরলো জেনির হাত। রক ক্যাস্‌ল-এর দিকে এগোলো ওরা। পেছন পেছন আমরা।

সেদিনই সন্ধ্যায়, জেনির সম্মানে বিরাট এক ভোজের আয়োজন করা হলো। কলা, কমলা, পেয়ারা, আপেলের মতো তাজা ফলের স্তূপ হয়ে উঠেছে টেবিলটা। মাটির জগ ভর্তি করে দেয়া হয়েছে টাটকা দুধ। ভাজা মাছ আর রোস্ট করা বিরাট এক রাজহাঁসও পরিবেশন করা হলো। দেয়ালে লেখা হয়েছে, 'স্বাগতম, প্রিয় জেনি মন্টরোজ'। গুহার কোণে কোণে বড় বড় পাত্রে নানা বর্ণের অসংখ্য ফুলের সমাহার।

মহা আনন্দে খেলাম আমরা। এলিজাবেথ আর আমার মাঝের চেয়ারে বসলো জেনি। জ্যাক আর আর্নেস্ট বসলো আমাদের ঠিক সামনে। পরিবেশন করলো ফ্রিৎস আর ফ্রান্সিস। ছেলেরা জেনিকে স্বাগতম জানিয়ে ছোট্ট করে বক্তৃতা দিলো। শুনে আনন্দে চকচক করে উঠলো জেনির মুখ।

খাওয়া দাওয়ার পর আমরা জেনিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালাম রক ক্যাস্‌ল-এর বিভিন্ন অংশ। চোখে রাজ্যের বিস্ময় আর প্রশংসা নিয়ে দেখলো ও। পরদিন ওকে নিয়ে গেলাম ফ্যালকন্‌স নেস্ট দেখাতে।

BanglaBook.org

শিগগিরই শীতের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার সময় এসে গেল। ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়তে হলো সবাইকে। জেনি খুব সাহায্য করলো এ সময়। এলিজাবেথ আর আমি ওকে আপন সন্তানের মতোই ভালোবাসতে শুরু করেছি।

কদিন পরেই এসে গেল শীত। দ্বীপে ওঠার পর এত আনন্দে আর কোনো শীত কাটাইনি আমরা। আমাদের পরিবারের কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিলো এতদিন, জেনি আসায় পূর্ণ হয়ে গেছে তা।

এরপর এলো বসন্ত। বরাবরের মতো এবারও খুব খুশির সঙ্গে স্বাগতম জানালাম ঋতু-রাণীকে। কিন্তু তখন কেউ ভাবতে পারিনি এই বসন্তই আমাদের জীবনে নিয়ে আসবে এক বিরাট পরিবর্তন।

মজার একটা ঘটনা ঘটলো। ফ্রিৎস আর জ্যাক গিয়েছিল টেন্ট হাউসে, সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখার জন্যে। কামানগুলো ঠিকমতো আছে কিনা দেখার জন্যে একটা গোলা ছুঁড়লো ওরা। এর পরই ঘটলো আশ্চর্য ঘটনাটা। বারসমুদ্র থেকে তিনবার কামান দেগে জবাব দিলো কেউ। সাগরে কোনো জাহাজ

থেকে এলো, না নিছক প্রতিধ্বনি, বুঝতে পারলো না ওরা। উত্তেজনার তুঙ্গে উঠে লাফাতে লাফাতে এসে খবরটা দিলো আমাকে।

'নিশ্চয়ই প্রতিধ্বনি,' বললাম আমি।

ছেলেরা মানতে চাইলো না কথাটা।

'উঁহুঁ, আমাদের তা মনে হয় না,' বললো ওরা। 'উপসাগরের ওপাশে নিশ্চয়ই একটা জাহাজ আছে।'

'ঠিক আছে, চলো তাহলে পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

ওদের সঙ্গে আমিও গেলাম টেন্ট হাউসে। আবার একবার কামানের শব্দ করা হলো। আশ্চর্য! এবারও জবাব ভেসে এলো।

খুশিতে লাফিয়ে উঠলো ছেলেরা। ওদের কথাই ঠিক। নিশ্চয়ই কেপ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টের অন্য পাশে একটা জাহাজ আছে।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম আমরা অসাধারণ খবরটা সবাইকে দেয়ার জন্যে। উত্তেজনায় টগবগ করতে করতে শুনলো ওরা। জেনি নিশ্চিত ধারণা করলো, ওর বাবাই ওর খোঁজে জাহাজ পাঠিয়েছেন। ছেলেরা তো পারলে তক্ষুণি রওনা দেয় জাহাজটা কোথায় দেখতে যাওয়ার জন্যে। আমি ঠেকালাম ওদের।

'শোনো,' বললাম আমি, 'খুবই সতর্ক হতে হবে আমাদের। কে জানে ওটা কি ধরনের জাহাজ? জলদস্যুদের জাহাজও তো হতে পারে।'

পরদিন ভোরে আমি আর ফ্রিৎস একটা ক্যানো নিয়ে বেরোলাম জাহাজটা দেখার জন্যে। সেফটি-বে পার হয়ে কেপ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টের অন্তরীপটা ঘুরতেই চোখের সামনে ভেসে উঠলো চমৎকার একটা পাল তোলা জাহাজ। নোঙ্গর করে আছে এখন। ইংল্যাণ্ডের পতাকা উড়ছে সেটার মাস্তুলের মাথায়।

জাহাজটার আরো কাছে নিয়ে গেলাম ক্যানো। দেখলাম নাবিকদের বেশির ভাগই ডাঙায় নেমেছে। সেখানে তাঁবু খাটিয়েছে ওরা। এখন সম্ভবত রান্নার জোগাড় করছে। মাত্র দু'জন পাহারাদার আর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রেখে গেছে জাহাজে।

'ইংরেজ! বন্ধু!' চিৎকার করলাম আমরা।

কিন্তু কর্মকর্তা ভাবলো আমরা স্থানীয় লোক, ব্যবসার জন্যে এসেছি। দেখার জন্যে কয়েকটা পুঁতির মালা আর কাঁচি ছুঁড়ে দিলো আমাদের দিকে। হেসে উঠলাম আমরা। আপাতত আর কিছু না বলে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সু-সংবাদটা জানাতে হবে সবাইকে।

রক ক্যাস্‌ল-এ ফেরা মাত্র সবাই ঘিরে ধরলো ফ্রিৎস আর আমাকে।

'সত্যিই একটা জাহাজ এসেছে ওখানে,' বললাম আমি। 'ইংল্যাণ্ডের ওটা। আশা করি নিশ্চিন্ত মনে ওটায় উঠতে পারবো আমরা। জেনির বাবা হয়তো আছেন ওতে।'

'সবচেয়ে ভালো কাপড়গুলো পরে যাবো আমরা,' বললো এলিজাবেথ। 'যত যা-ই হোক এত বছর পর নতুন মানুষের সামনে যাবো, ভালো পোশাক না পরে গেলে কি হয়? আর হ্যাঁ, আমরা কিন্তু পানসিতে করে যাবো। ক্যাপ্টেন যেন না ভাবতে পারে আমরা নেহায়েতই জাহাজডুবি হওয়া কয়েকজন হতভাগ্য মানুষ।'

BanglaBook.org

সেরা কাপড়চোপড়গুলো পরে নিয়ে আমরা *এলিজাবেথ*-এ চড়লাম। জাহাজটার কাছাকাছি পৌঁছে তোপধ্বনি করলাম একবার! কয়েক মুহূর্ত পরেই জবাব ভেসে এলো ওটা থেকে।

জাহাজটার নাম *ইউনিকর্ন*। ধীরে ধীরে ওটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের পানসি। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে জাহাজটার নাবিক ও যাত্রীরা। সবার চোখে বিস্ময়।

অবশেষে ইউনিকর্ন-এর গায়ে গিয়ে ভিড়লো পানসি। ইউনিকর্ন-এর ক্যাপ্টেন মিস্টার লিট্‌লটন আমাদের সহৃদয় আহ্বান জানালেন তাঁর জাহাজে। সংক্ষেপে আমাদের আর জেনির ইতিহাস শোনালাম তাঁকে। মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনলেন তিনি। তারপর জানালেন, জেনির খোঁজেই পাঠানো হয়েছে তাঁকে। জেনি নিরাপদে আছে শুনে খুশি হয়েছেন তিনি।

পরিচয় এবং আলাপ পর্ব শেষ হলে আমি ক্যাপ্টেন লিট্‌লটনকে আমন্ত্রণ জানালাম আমাদের পানসিতে। তাঁর জাহাজের চার যাত্রী–মিস্টার ও মিসেস উওলস্টন আর তাঁদের দুই কিশোরী কন্যাকে নিয়ে এলেন তিনি। পানসিতে যথাসাধ্য তাদের সমাদর করলাম আমরা। তারপর নিয়ে গেলাম রক ক্যাস্‌ল-এ।

আমাদের গুহাবাড়ি আর তার যাবতীয় আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম দেখে খুবই আনন্দিত হলেন তাঁরা। সন্ধ্যায় ইউনিকর্নএ ফিরে গেলেন ক্যাপ্টেন লিট্‌লটন। উওলস্টন পরিবার আমাদের অতিথি হলেন। পরদিন সকালে আমাদের খামার, বাগান, ক্ষেত দেখালাম তাঁদের।

'আপনাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না,' আমার হাত ধরে বললেন মিস্টার উওলস্টন। 'কি বলে আপনাদের বাড়ির প্রশংসা করবো তা আমার জানা নেই। বহুদিন ধরে ঠিক এমন একটা জায়গা-ই খুঁজছি আমরা। আমি এবং আমার পরিবার সাদাসিধে জীবন-যাপনে বিশ্বাসী। আমরা চাই শান্তিপূর্ণ, শান্ত পরিবেশ। এখানে ঠিক সে জিনিসই খুঁজে পেয়েছি আমরা। আমরা যদি আপনাদের দ্বীপে থেকে যেতে চাই তাহলে কি আপত্তি করবেন?'

'আপত্তি করবো মানে! আমরা তো বর্তে যাবো রীতিমতো। যদি থাকেন, দ্বীপের অর্ধেকটা দিয়ে দেবো আপনাদের। আপনি আর আপনার স্ত্রী আমাদের বন্ধু হবেন, আপনার মেয়েরা আমার ছেলেদের বোন হবে।'

সমাধান হয়ে গেল ব্যাপারটার।

এদিকে মিস্টার লিটলটনের কাজ শেষ। যে উদ্দেশ্যে তিনি এসেছেন তা সফল হয়েছে। এবার তিনি পাল তুলে দিতে চান। রওনা হওয়ার কয়েকদিন আগে এক সন্ধ্যায় তাঁর এবং তাঁর নাবিকদের সম্মানে এক ভোজের আয়োজন করলাম আমরা। সেখানে ক্যাপ্টেন লিট্‌লটন জিজ্ঞেস করলেন, আমরা তাঁর সাথে ইউরোপে ফিরতে চাই কিনা।

আমার তেমন কোনো ইচ্ছে নেই। যতদূর জানি আমার স্ত্রীরও নেই। তবু জিজ্ঞেস করলাম ওকে। নির্দ্বিধায় মাথা নাড়লো ও।

ছেলেদের মনোভাব কি তা জানি না। তাই ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম।

BanglaBook.org

'তোমরা কি ক্যাপ্টেন লিট্‌লটনের সাথে ইউরোপে যাবে, না মা-বাবার সাথে এখানেই থাকবে?'

জ্যাক আর ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, 'আমরা এখানেই থাকবো।'

ফ্রিৎস আর আর্নেস্ট নীরব।

'তোমরা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'বাবা,' বললো ফ্রিৎস, 'আমি ক্যাপ্টেন লিট্‌লটনের সঙ্গে যেতে চাই। আমাদের এই ছোট্ট দ্বীপের বাইরে যে পৃথিবী আছে তাকে দেখতে চাই।'

'আসলে তুমি জেনির কাছাকাছি থাকতে চাও, তাই যেতে চাইছো,' মনে মনে বললাম।

'তুমি, আর্নেস্ট?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আমিও দুনিয়া দেখতে চাই।'

তার মানে ওরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে ওরা। হয়তো জীবনে আর কখনো দেখবো না ওদের। বুকের ভেতর কেমন যেন একটা হুহু করা অনুভূতি হলো আমার। এলিজাবেথের দিকে তাকালাম। কিন্তু ও নির্বিকার। জানে ছেলেরা বড় হয়েছে, এখন ওদের ইচ্ছায় বাধা দেয়া ঠিক না, বিশেষ করে ইচ্ছাটা যখন খারাপ নয়। তাছাড়া সত্যিই তো জীবনে উন্নতি করতে হলে এ-দ্বীপে পড়ে থাকার কোনো অর্থ নেই। ছেলের উন্নতি চায় না কোন মা? তবে ওর মুখ দেখে একটা কথা আমার মনে হলো, অনেক কষ্ট করে হলেও ছেলে হারাবার বেদনা চাপছে ও। মুখে বললো, 'ওরা ওদের ভালোর জন্যেই যাচ্ছে। আমি জানি ওরা সুখী হবে, আমার দুঃখ পাওয়ার কোনো কারণ নেই।'

দুটো সন্তান হারাতে যাচ্ছি আমরা, তবে সান্ত্বনা, উওলস্টন, পরিবারকে পাচ্ছি বন্ধু হিসেবে।

আরো এক সপ্তাহ উপকূলে থাকলো ইউনিকর্ন। সেই সময়ের ভেতর আমরা আমাদের সব ধন সম্পদ–মুক্তা, এলাচ, ফার, তুলে দিলাম জাহাজে যাতে ইউরোপে পৌঁছে ছেলেদের কষ্টে পড়তে না হয়। দ্বীপে আমাদের জীবন যাপন নিয়ে আমি যে দিনলিপি লিখেছি সেটা প্রকাশ করার জন্যে তুলে দিলাম ফ্রিৎস-এর হাতে। আশা করছি ওটা পড়ে ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম আর সাধারণ জ্ঞানের মূল্য সম্পর্কে অনেক কিছু শিখতে পারবে পাঠক।

যেদিন ওরা চলে গেল তার আগের রাতে আমরা কেউ ঘুমাতে পারলাম না। শেষ দিনের দিনলিপি লিখতে লিখতে ভিজে উঠলো আমার দু'চোখ।

পরদিন খুব ভোরে উঠে পড়লাম আমরা। দুই ছেলে আর জেনিকে আশীর্বাদ করলাম। বিদায় জানালাম। ছল ছল চোখে নৌকায় উঠলো ওরা। ধীর গতিতে দাঁড় টেনে জাহাজে পৌঁছুলো। একটু পরেই নোঙ্গর তুলে পাল উঠিয়ে দিলো ইউনিকর্ন। যতক্ষণ না জাহাজটা দিগন্তে মিলিয়ে গেল ততক্ষণ সৈকতে দাঁড়িয়ে হাত নাড়লাম আমরা। ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করুন, এবং বিপদ থেকে দূরে রাখুন!

***

BanglaBook.org